সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২

# শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

## মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার

বইপ্রেমীরা যে কোনো সময় স্বাধীনভাবে বই নিতে ও ফেরত দিতে পারেন

## বিনম্র শ্রদ্ধায়

# সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালকের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

২২ আগস্ট ছিল সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পারিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী। এদিন সিদীপের প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের সব শাখার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী বিনম্র শ্রদ্ধায় তাদের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালককে স্মরণ করেন। বিকেল সাড়ে তিনটায় সিদীপের সভাকক্ষে তাঁর স্মরণে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, কবিতা আবৃত্তি, আলোচনা এবং তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদাসহ প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মী এতে উপস্থিত ছিলেন। সিদীপ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ফজলুল বারি, ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া, সদস্য ফাহমিদা করিম এবং অডিট-প্রধান ডেপুটি ম্যানেজার আমিনুল ইসলাম মরহুম মোহাম্মদ ইয়াহিয়াকে নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা করেন। কবতিা পড়েন মোহাম্মদ মাহবুব উল আলম, মিঠুন দেব ও মনজুর শামস। সব শেষে দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ মওলানা হাবিবুর রহমান। এদিন শাখা অফিসসমূহে তাঁর ওপর স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা, প্রামাণ্যচিত্র

প্রদর্শন, দোয়া করা হয় এবং প্রতিটি শাখায় একটি করে ফলজ বৃক্ষ রোপণ করা হয়।

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন
ইমেইল: shikkhalokcdip@gmail.com, ফেসবুক: শিক্ষালোক বুলেটিন

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

# শিক্ষালোক

জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০২২ ● ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

## সূচি

শিক্ষালোক সিদীপের আরও একটি ইনোভেশন - ফজলুল বারি ২
মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার - মোহাম্মদ মাহবুব উল আলম ৪
নিভৃত গাঁয়ে আলোর মশাল - আরিফুল ইসলাম ৭
নপম গ্রন্থাগার - রেজাউল করিম শেখ ও আরিফুল ইসলাম ৮
স্কাইলার্ক পথপাঠাগার - অলোক আচার্য ১০
চিত্রগৃহ চাটমোহর পাঠাগার - জেমান আসাদ ১২
একজন সমাজব্রতী শিক্ষক - আশেক মাহমুদ সোহান ১৩
শতবর্ষী বিদ্যালয় - অশ্রুজিত রায় ১৫
আমার শিক্ষকতা জীবনের ৩৪টি বছর - মো. জাকির হোসেন সরকার ১৬
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ১৭
কবিতা ১৮
সজনে ডাটা ও তালের পুষ্টিগুণ - পুষ্টিবিদ ফাহমিদা করিম ২১
সফলতার গল্প - মো. জাহিদ হাসান ২৩
বই-আলোচনা ২৪
ভ্যান গঘের ভুবনে অবগাহন - আশরাফ আহমেদ ২৭

**প্রধান সম্পাদক**
মিফতা নাঈম হুদা

**সম্পাদক**
ফজলুল বারি

**নির্বাহী সম্পাদক**
আলমগীর খান

ডিজাইন ও মুদ্রণ
আইআরসি irc.com.bd

# সম্পাদকীয়

সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক ও শিক্ষালোকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মানব-উন্নয়নকে শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে মনে করতেন। সে কারণে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তার উদ্দেশ্যে সিদীপ আড়াইহাজার উঠানস্কুল পরিচালনা করছে যেখানে প্রাকপ্রাথমিক, ১ম ও ২য় শ্রেণির প্রায় ৫০ হাজার শিশু প্রতিদিনের পড়া তৈরি করে পরদিন স্কুলে যেতে পারছে। এ বছর ২২ আগস্ট ছিল উন্নয়ন কর্মবীর মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ছিলেন মানবতাবাদী, দেশপ্রেমিক, জ্ঞানানুরাগী, বইপ্রেমী এক উদারচিত্ত ব্যক্তিত্ব। তাঁর অফিস কক্ষটি ছিল বইয়ে ভরা। স্বপ্ন ছিল সংস্থায় একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের–যার প্রস্তুতি এখন শেষ পর্যায়ে। এর মধ্যে শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির অনেক শিক্ষিকা ও সুপারভাইজার নিজ নিজ এলাকার বইপড়ুয়া মানুষদের কাছ থেকে বই সংগ্রহ করেছেন। উদ্দেশ্য স্থানীয় কোনো স্কুলকলেজে শ্রেণিকক্ষের বাইরের কোনো দেয়ালে একটি বইয়ের তাক লাগিয়ে সেখানে বইগুলো রেখে দেয়া। যেখান থেকে শিক্ষার্থীরা কোনো তদারকি ও বাধা ছাড়াই ইচ্ছেমত বই নিয়ে যেতে পারবে ও পড়া শেষে নিজ দায়িত্বে ফেরত দিয়ে যাবে। নাটোরের লালপুরে ও রাজশাহীর বাঘায় এ উদ্যোগটি প্রথম শুরু হয়। শিক্ষিকা ও সুপারভাইজারগণ এরকম দেয়ালে ঝুলানো বইয়ের শেলফের নাম দেন 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার'।

এরপর দেখতে দেখতে আরও ৯টি ব্রাঞ্চের কর্ম-এলাকায় অবস্থিত স্কুল-কলেজে 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার' স্থাপিত হয়েছে। আরও অনেক ব্রাঞ্চের শিক্ষাসুপারভাইজারগণ বই সংগ্রহ করেছেন ও নিজ এলাকার স্কুলকলেজে এরূপ মুক্তপাঠাগার স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছেন। আমাদের পরিকল্পনা শুরুতে ২১টি ব্রাঞ্চে বিভিন্ন স্কুলকলেজে 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার' স্থাপন ও তা পরিচালনার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন। এটি একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। ২১টি স্কুলকলেজে স্থাপিত মুক্তপাঠাগারের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে পরবর্তীতে আমরা এটি সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করবো।

সিদীপের এই নতুন উদ্যোগ নিয়ে এবারকার শিক্ষালোকের মূল আয়োজন। সংস্থার অন্যান্য কর্মকাণ্ড বিষয়ে এবং জ্ঞানানুরাগী ও সাহিত্যপ্রেমী পাঠকদের জন্য অন্যান্য আয়োজন তো আছেই।

ফজলুল বারি

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
বাসা নং-১৭, রোড নং-১৩, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি লি:, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৪৮১১৮৬৩৩, ৪৮১১৮৬৩৪।
Email : info@cdipbd.org, web: www.cdipbd.org

# শিক্ষালোক সিদীপের আরও একটি ইনোভেশন

**ফজলুল বারি**

সিদীপ। একটি এনজিও অর্থাৎ একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম। যারা পরিচিত তারা সকলেই একে সিদীপ নামেই জানেন এবং চেনেন। কিন্তু সিদীপ বলতে কি বুঝায় তা হয়তো অনেকেই জানেন না বা জানার প্রয়োজনও বোধ করেন না, কেননা এটি সিদীপ নামেই পরিচিতি পেয়ে গেছে। এটি আসলে একটি সংক্ষেপণ বা 'এব্রিভিয়েশন'। এর পুরো নাম 'সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন্ এন্ড প্র্যাকটিসেস'। 'ইনোভেশন' শব্দটির আভিধানিক অর্থ নব্যতাপ্রবর্তন। আমাদের দেশে যে সকল এনজিও কাজ করে তারা মূলত ক্ষুদ্রঋণ নিয়েই কাজ করে অথবা অন্য কোন ধরনের কাজ দিয়ে শুরু করলেও ক্ষুদ্রঋণ একটি মূল কাজ হয়ে যায়। জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ নব্বইয়ের দশকের শুরুতে একটি নব্যতাপ্রবর্তন কাজ হিসাবে বিবেচিত হলেও পরবর্তীতে সকল এনজিওর জন্য এটি একটি সাধারণ কাজ হিসাবেই পরিচিত হয়ে আসছে এবং চলমান রয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ, যেহেতু গরীব মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে, তাই যারা ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে কাজ শুরু করেছেন তারা গরীব মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্যও পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। সিদীপও সে পথ অনুসরণ করে তার সদস্যদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য কল্যাণ ও সেবামূলক কাজ করে আসছে।

তবে সিদীপ মনে করে যে গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গরীব ছাত্রছাত্রীদের স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ করতে ক্লাশের পড়া শিখন, বঞ্চিত ও অবহেলিত ছোট ছোট গরিব শিক্ষার্থীদের দ্বারা সংস্কৃতি চর্চা, প্রকৃতি পাঠ এবং অতি সম্প্রতি মুক্তপাঠাগার স্থাপন ইত্যাদি সমন্বয়ে গঠিত তাদের 'শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি' (শিসক) শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নব্যতাপ্রবর্তন কাজ এবং সে স্বীকৃতিও তারা পেয়েছে। শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি প্রবর্তনের পরে তারা যখন স্বাস্থ্য কর্মসূচি প্রচলনের জন্য নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শেষে একটি মোটামুটি সফল স্বাস্থ্য কর্মসূচি চালু করতে সক্ষম হয় তখন তারা এটিকেও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে তাদের আর একটি নব্যতাপ্রবর্তন কাজ হিসাবে নিজেরা বিবেচনা করে। কারণ কোন ধরনের বিদেশি সাহায্য ছাড়া নিজেদের অর্থ ও বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে এটি এমন একটা সময় চালু হয় যখন খুব বেশি একটা এনজিও এ বিষয়ে কাজ শুরু করতে পারেনি।

যাই হউক। আমার আজকের লেখাটি সিদীপের অন্য একটি কাজ নিয়ে। শিক্ষালোক–এটি সিদীপের একটি ত্রৈমাসিক বুলেটিন। ২০১৪ সালের জুন থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে (তখন মাসিক বুলেটিন আকারে)। একটি এনজিও কর্তৃক প্রকাশিত কি ধরনের বুলেটিন এটি? শুরু থেকেই আমি এর নিয়মিত পাঠক। শিক্ষালোকের তিনটি বৈশিষ্ট্য আমার চোখে ধরা পড়ে।

প্রথম, আপনি যদি লক্ষ্য করে থাকেন তাহলে দেখবেন যে শিক্ষালোকের বহু সংখ্যায় যে প্রচ্ছদ ছাপা হয় তা এ উপমহাদেশে কোন না কোন মনীষীর ছবি নিয়ে যারা আমাদের সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, সমাজসংস্কারে, শিল্পকর্মে বা কবিতায় বিশেষ অবদানের জন্য বিখ্যাত, খ্যাতিমান ও সুপ্রতিষ্ঠিত। তাদের মূল্যবান লেখা বা কর্ম থেকে অংশবিশেষ পুনর্মুদ্রণ করে শিক্ষালোক তাদের অবদানকে স্মরণ করে এবং তাদের চিরন্তন বাণীকে এখনকার পাঠকদের মনে করিয়ে দেয়। অনেক পাঠকই বিষয়টির প্রশংসা করে আমাদের ধন্যবাদ জানান। আমরাও তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্যটি আমি লক্ষ্য করি সে সম্পর্কে একটু আলোচনা করি। সিদীপ মূলত গ্রামের মানুষের সঙ্গে, বিশেষ করে গরিব মানুষের সঙ্গে কাজ করে। সিদীপের নানা ধরনের কর্মসূচিতে অসংখ্য পুরুষ ও মহিলা কর্মী প্রতিদিন তাদের সাথে মেলামেশা করে, তাদের কাজের সঙ্গী হয়ে যায়। এর মাধ্যমে গ্রামের মানুষ যারা উন্নয়ন কাজে অংশ নিয়ে ভাগ্য পরিবর্তনে নিজেকে নিয়োজিত রাখে এই কর্মীরা তাদের বাস্তব কাজের প্রত্যক্ষদর্শী এবং অনেকক্ষেত্রে অংশীদারও বটে। তাদের এই বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান অর্জনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লেখার জন্য শিক্ষালোক তাদের সবসময় উৎসাহিত করে। কেননা এটিকেই সিদীপ জীবনধর্মী লেখা হিসাবে বিবেচনা করে। এটি ঠিক যে সবাই লিখতে পারেন না বা লেখেন না। কিন্তু এমন অনেকেই আছেন যারা লিখতে চান, হয়ত কেউ ছাপবে না বলে লেখেন না। শিক্ষালোক তাদেরকেই উৎসাহিত করে। তাদের লেখা ছাপে। তাদের জীবনধর্মী লেখা থেকে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারি, শিখতে পারি। এ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সিদীপ বেশ কিছু নবীন লেখকদের উদ্ভব ঘটিয়েছে।

আর তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে, যারা তরুণ বা প্রবীণ লেখক এবং শিক্ষালোকের পাঠকদের উদ্দেশ্যে লেখেন তাদের লেখাও প্রতি সংখ্যায় ছাপা হয়। এতে স্থান পায় নানা বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, বিজ্ঞানভিত্তিক কল্পকাহিনী ও আরও অনেক কিছু।

উল্লিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটিয়ে সিদীপ, একটি এনজিও, গত প্রায় এক দশক ধরে নিয়মিত প্রকাশ করে যাচ্ছে শিক্ষালোক নামের এই ত্রৈমাসিক সাময়িকী।

> সিদীপ মনে করে যে গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গরীব ছাত্রছাত্রীদের স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ করতে ক্লাশের পড়া শিখন, বঞ্চিত ও অবহেলিত ছোট ছোট গরিব শিক্ষার্থীদের দ্বারা সংস্কৃতি চর্চা, প্রকৃতি পাঠ এবং অতি সম্প্রতি মুক্তপাঠাগার স্থাপন ইত্যাদি সমন্বয়ে গঠিত তাদের 'শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি' (শিসক) শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নব্যতাপ্রবর্তন কাজ এবং সে স্বীকৃতিও তারা পেয়েছে। শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি প্রবর্তনের পরে তারা যখন স্বাস্থ্য কর্মসূচি প্রচলনের জন্য নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শেষে একটি মোটামুটি সফল স্বাস্থ্য কর্মসূচি চালু করতে সক্ষম হয় তখন তারা এটিকেও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে তাদের আর একটি নব্যতাপ্রবর্তন কাজ হিসাবে নিজেরা বিবেচনা করে। কারণ কোন ধরনের বিদেশি সাহায্য ছাড়া নিজেদের অর্থ ও বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে এটি এমন একটা সময় চালু হয় যখন খুব বেশি একটা এনজিও এ বিষয়ে কাজ শুরু করতে পারেনি

এনজিওদের ক্ষেত্রে এ ধরনের বুলেটিন প্রকাশ কিংবা কিছুটা সাহিত্যঘেঁষা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়। এর রূপকার ছিলেন সিদীপের প্রয়াত নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া। জ্ঞানলিপ্সু, সাহিত্যপ্রেমী ও বিজ্ঞান-অনুরাগী বলেই তিনি এই ব্যতিক্রমধর্মী কাজটি করতে পেরেছিলেন। এটি সিদীপের জন্য অবশ্যই আরও একটি নব্যতাপ্রবর্তন কাজ, ইংরেজিতে যেটি ইনোভেশন। অনেক সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা করেই প্রতিষ্ঠানটির তিনি নামকরণ করে গেছেন 'সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস' (সিদীপ)।

## বইপড়া আন্দোলনে নতুন সম্ভাবনা

# মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার

**মোহাম্মদ মাহবুব উল আলম**

বিজ্ঞানের অগ্রগতির এই সময়ে আমাদের শিক্ষার্থীরা যতোটা না প্রযুক্তির সুফল ভোগ করছে তারচে অনেক বেশি এর ক্ষতিকর দিকগুলোতে অভ্যস্ত/আসক্ত হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে মোবাইলের প্রতি আসক্তি বেড়ে যাচ্ছে আশংকাজনকভাবে। এরমধ্যে গেমিং, ফেসবুকিং, টিকটকসহ নানাবিধ এ্যাপস্ উল্লেখযোগ্য। করোনার ভয়াল সময়ে যখন স্কুলকলেজ বন্ধ থাকে তখন অনলাইন ক্লাসের উছিলায় মা-বাবারা একরকম বাধ্য হয় ছেলেমেয়েদের হাতে স্মার্টফোন তুলে দিতে। ফলে অন্য যেকোন সময়ের তুলনায় স্মার্টফোন তাদের কাছে সহজলভ্য হয়ে যায়। তারা অনলাইন ক্লাসের নামে বাবা-মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে অভ্যস্ত হতে থাকে সময় হত্যাকারী সেসব এ্যাপসে। ফ্রি ফায়ার নামে এক গেমসে আসক্ত কয়েকজন শিক্ষার্থীর সাথে কথা বলে জানা যায় তারা গড়ে প্রতিদিন ১০-১২ ঘন্টা গেমস খেলেছে, একজন তো একটা লেভেল ক্রস করার জন্য একদিনে সর্বোচ্চ ২১ ঘন্টা পর্যন্ত সময় দিয়েছে। শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে হয়ে উঠছে অমনোযোগী, অবসাদগ্রস্ত, বেপরোয়া। হারাচ্ছে তাদের পারিবারিক আবেগ, মূল্যবোধ, দায়িত্বজ্ঞান। গেমস খেলার জন্য মোবাইল ডাটা কিনতে পিতার কাছে ৫০ টাকা চেয়ে না পেয়ে নবম শ্রেণির ছাত্রের আত্মহত্যা করার নজিরও সৃষ্টি হয়ে আছে এই দেশে। প্রতিটি গ্রাম-মহল্লার চিত্রই আজ অনেকটা একইরকম। শিক্ষার্থীরা আজ পাঠ্যবইসহ যেকোন ধরনের বই পড়া থেকেই ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে তাদের জ্ঞানসমুদ্রে সাঁতার কাটার আগ্রহ এবং পথ।

ব্রিটিশ লেখিকা ক্যাথারিন প্যাটারসনের মতে, "কেবল শিশুদের পড়তে শেখানোই যথেষ্ট নয়, আমাদের তাদের পড়ার উপযুক্ত কিছু দিতে হবে। এমন কিছু যা তাদের ধারণাগুলি প্রসারিত করবে, এমন একটি জিনিস যা তাদের নিজের জীবনের অনুভূতি তৈরি করতে এবং তাদের জীবন থেকে তাদের থেকে পৃথক হওয়া মানুষের দিকে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে।"

অথচ আমরা আজ তাদের হাতে সেই পড়ার উপযুক্ত বই তুলে দিতে ব্যর্থ হচ্ছি। শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের রাজ্যে ডুব দেয়ার চেয়ে মোবাইল গেমিংয়ে ডুবে থাকতেই বেশি আগ্রহী হচ্ছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের শিক্ষাদানের ধরন। যেখানে জীবনের শুরুতেই আমরা শিশুদের পিঠে চাপিয়ে দেই বইয়ের পাহাড়। নামিয়ে দেই পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার/এ+ পাওয়ার এক পাগলা রেসে। সৃজনশীল পদ্ধতির আড়ালে সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর শেখা চলে গাইড বই থেকেই। শিক্ষার্থীরা বন্দি হয় গৎবাঁধা সিলেবাসের এক ছোট্ট কুয়ায়। সেখান থেকে তারা ওই আকাশটাকে কুয়ার সমানই ঠাহর করে। ধারণাই করতে পারে না আকাশের বিশালতা সম্পর্কে। আমরাও আমাদের কাঙ্ক্ষিত ভালো ফল হাতে পেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলি। বাচ্চাদের যেমন জোর করে খাওয়াতে গেলে একসময় অতীব প্রয়োজনীয় এই খাওয়ার প্রতিই তাদের অনীহা চলে আসে তেমনি আরাধ্য এ+ পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সিলেবাস গিলতে গিলতে একসময় অধিকাংশই হয়ে উঠে পাঠবিমুখ। পাঠবিমুখতা থেকে বিনোদনের মাধ্যম ও সময় কাটানোর মাধ্যম হিসাবে

তারা ঝুঁকে পড়ে মোবাইলের দিকে। অসুস্থ প্রতিযোগিতার জন্য আজ বিদ্যালয়গুলোও জ্ঞানার্জনের চেয়ে, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অর্জনের চেয়ে ঢের বেশি প্রাধান্য দেয় ভালো ফলাফল অর্জনকেই। আমরা হয়তো শিক্ষার্থীদের পড়ার মূল উদ্দেশ্যই উপলব্ধি করাতে পারছি না। পড়ার মূল উদ্দেশ্য যখন জ্ঞান অর্জন না হয়ে এ+ অর্জন হয়ে যায়, তখন ফলাফল হিতে বিপরীত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

**মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্ত পাঠাগারের ধারণা**

বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২১.৪% অর্থাৎ প্রায় ৩.৫ কোটি কিশোর-কিশোরী, যাদের বয়স ১০-১৯ বছরের মধ্যে। সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশিত এক খবরে দেখা যায়, দেশের কিশোর-কিশোরীর প্রায় ৯০% মোবাইল ব্যবহার করছে। যাদের প্রায় ৯৭ ভাগ জীবনের কোন না কোন সময় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে বা করছে। দেশের জনগণের এই বিশাল অংশকে জ্ঞানার্জনের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনতে, তাদের মধ্যে জ্ঞানতৃষ্ণা জাগ্রত করতে, তাদের আত্মার মাঝে জমাট বাঁধা বরফ ভাঙতে, মাছির মতো অসংখ্য চোখ সৃষ্টি করতে, জ্ঞানসমুদ্রে অবগাহনের সুযোগ সৃষ্টি করতেই মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। যেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন সুবিধাজনক খোলা জায়গায় স্থানীয়ভাবে বই সংগ্রহ করে পাঠাগারটি স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে এলাকাবাসী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছায় বই দানের মাধ্যমে পাঠাগারটিকে বইসমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যারা পাঠক এখানে তারাই বইদাতা হবেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এটি একটি সমৃদ্ধ পাঠাগারে পরিণত হবে। শিক্ষার্থীরাসহ যে কেউ উন্মুক্ত রেজিস্টারে তার নাম, ফোন নাম্বার ও গৃহীত বইয়ের নাম লিপিবদ্ধ করে তার পছন্দমতো বই পড়ার জন্যে নিয়ে যেতে পারবে এবং পড়া শেষ হলে তা যথাস্থানে রেখে দিবে। কারো কোন অনুমোদনের দরকার পড়বে না। যদি প্রতিষ্ঠানের সকলকে বই পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তোলা যায় তবে মুক্ত পাঠাগারে বই ও পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি করা শুধু সময়ের ব্যপার হবে মাত্র। স্থানীয়ভাবে কোন বইপ্রিয় ব্যক্তি বা শিক্ষককে উদ্বুদ্ধ করে মাসে কমপক্ষে একটি পাঠচক্র আয়োজন, ত্রৈমাসিক একটি প্রতিযোগিতা আয়োজন করার ব্যপারেও চিন্তা করা হচ্ছে। যা মুক্তপাঠাগার ধারণাটিকে আরও গতিশীল ও টেকসই করে তুলবে।

সিদীপ সর্বপ্রথম ২রা জুলাই ২০২২এ নাটোরের লালপুরে সিরাজীপুর দাঁইড়পাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এই কার্যক্রম শুরু করে। যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক জনাব ফ্লোরা পারভীন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সভাপতি জনাব মকবুল হোসেন ও সিদীপ গোপালপুর শাখার ব্যবস্থাপক জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, শিসক শিক্ষা সুপারভাইজার আজমীরা খাতুন ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৪ জুলাইয়ে বাঘা শাখার আওতায় বাঘা আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ, সিদীপের শাখা ব্যবস্থাপক মো. নাসির উদ্দিন ও শিক্ষাসুপারভাইজার ফাহমিদা জেসমিনের উপস্থিতিতে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন হয়।

২৪ জুলাইয়ে রাজশাহী জেলার পুঠিয়া শাখার আওতায় পুঠিয়া শাখা ব্যবস্থাপক জনাব মো: সাইফুল ইসলামের উদ্যোগে ও শিক্ষাসুপারভাইজার আমিনা খাতুনের প্রচেষ্টায় ভাটপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার কার্যক্রম শুরু হয়।

২৫ জুলাই ২০২২এ পাবনার দেবোত্তরে দেবোত্তর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক জনাব মাহবুবা মায়া, সিদীপের শাখা ব্যবস্থাপক শহীদুল ইসলাম ও শিক্ষাসুপারভাইজার কাকলি খাতুন এবং সিদীপের গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খানের উপস্থিতিতে মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন হয়।

২৬ জুলাই ২০২২এ সিদীপ বালুচর শাখায় বোয়ালমারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইশারত আলী, শাখাব্যবস্থাপক মোজাফফর হোসেন, শিক্ষাসুপারভাইজার পপি খাতুন এবং গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খানের উপস্থিতিতে মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন হয়।

২৭ জুলাই ২০২২এ নাটোরের বনপাড়ায় সেন্ট যোসেফস্ স্কুল এণ্ড কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার শঙ্কর, এরিয়া ম্যানেজার মো. শামসুল আলম, শাখা ব্যাবস্থাপক মো. মাজেদুল ইসলাম, শিক্ষাসুপারভাইজার সুমি খাতুন এবং গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খানের উপস্থিতিতে মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন হয়।

২রা আগস্ট ২০২২এ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার চারগাছ শাখায় চারগাছ এন আই ভূঁইয়া

জ্ঞানসমুদ্রে অবগাহনের সুযোগ সৃষ্টি করতেই মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। যেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন সুবিধাজনক খোলা জায়গায় স্থানীয়ভাবে বই সংগ্রহ করে পাঠাগারটি স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে এলাকাবাসী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছায় বই দানের মাধ্যমে পাঠাগারটিকে বইসমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যারা পাঠক এখানে তারাই বইদাতা হবেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এটি একটি সমৃদ্ধ পাঠাগারে পরিণত হবে

উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মজিবর রহমান, সিদীপের গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খান, ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার কে. এইচ. শফিকুল ইসলাম, এরিয়া ম্যানেজার মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, শাখা ব্যবস্থাপক মো. মোকলেসুর রহমান এবং শিক্ষা সুপারভাইজার নাজমার উপস্থিতিতে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার কার্যক্রম শুরু হয়।

১৬ আগস্টে পাবনার ভাঙ্গুরা শাখার আওতায় ভাঙ্গুরা ইউনিয়ন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ নাহিদ হাসান খান 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার' উদ্বোধন করেন। এসময় প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ জনাব রফিকুল ইসলাম, সিদীপের গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মাহবুব উল আলম, শাখা ব্যবস্থাপক মো. ইলিয়াছ হোসেন, হিসাবরক্ষক মো. সাহাদুল ইসলাম ও শিক্ষাসুপারভাইজার সালমা খাতুন উপস্থিত ছিলেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ নাহিদ হাসান খান সিদীপের এই উদ্যোগকে সময়োপযোগী উদ্যোগ বলে অভিহিত করেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রচুর বই পড়ার আহ্বান জানান।

৩০ আগস্টে নাটোরের বড়াইগ্রামে রাজাপুর ডিগ্রী কলেজে কলেজের সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ, সিদীপের এরিয়া ম্যানেজার মো. শামসুল আলম, শাখা ব্যবস্থাপক মো. আরিফুজ্জামান, শিক্ষাসুপারভাইজার সুমি আক্তার ও উপসহকারি কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার মো. মুশফিকুর রহমানের উপস্থিতিতে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন হয়।

৮ সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নয়নপুরে রাবেয়া মান্নান ভুঁইয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক জনাব জসিম উদ্দিন, সিদীপের এএম জনাব ওবায়দুর রহমান তালুকদার, বিএম আল ইমরান হোসেন, শিক্ষাসুপারভাইজার নাসরিন আক্তার, ব্র্যাকের অন্যান্য স্টাফ ও শিক্ষিকাগণ। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীরা উদ্যোগটিকে অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক বলে মন্তব্য করেন ও এর সাফল্য কামনা করেন।

১৯ সেপ্টেম্বরে নাটোরে সিংড়ায় দমদমা পাইলট স্কুল এন্ড কলেজে মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম, সাংবাদিক মো. সাইফুল ইসলাম, সিদীপের ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার মো. রশিদুল ইসলাম, এরিয়া ম্যানেজার মো. খোরশেদ আলম, সিংড়ার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মো. মোশারফ হোসেন এবং শিক্ষাসুপারভাইজার সাবরিনা সুলতানা। আরো উপস্থিত ছিলেন কলেজের সহকারি শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্রছাত্রী।

পর্যায়ক্রমে সিদীপ তার সকল কর্ম-এলাকায় কমপক্ষে একটি করে মুক্তপাঠাগার স্থাপন করার মধ্য দিয়ে অধিক সংখ্যক জ্ঞানপিপাসু পাঠক সৃষ্টি করার চেষ্টা অব্যাহত রাখবে এবং একটি উন্নত সমাজ গঠনের চেষ্টা করবে। বর্তমান প্রজন্মকে মুখস্থনির্ভর বিদ্যার্জন থেকে জ্ঞানার্জনের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনতে পাঠাগারের বিকল্প নাই। সাধারণত আমাদের দেশের প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাগার থাকলেও তাতে নানা কারণে শিক্ষার্থীদের প্রবেশাধিকার অনেকটাই সংরক্ষিত। বেশিরভাগ পাঠাগারই পাঠক খরায় ভুগছে। যেখানে শিক্ষকদের উৎসাহদানের ঘাটতির পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের অনীহা ও সিলেবাস সম্পন্ন করার চাপ দায়ী। মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার আন্দোলনটি সফল হলে আমাদের আগামি প্রজন্মের সামনে জ্ঞানচর্চার এক নতুন দ্বার উন্মুক্ত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

*লেখক: গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা*

# তিতাস গণগ্রন্থাগার
# নিভৃত গাঁয়ে আলোর মশাল

## আরিফুল ইসলাম

অন্ধকারে আচ্ছাদিত মানুষের মনকে জাগিয়ে তোলার প্রয়াসে "বিকশিত হোক জ্ঞান, ঘুচে যাক আঁধার" এই প্রতিপাদ্যের আলোকে কতিপয় বইপ্রেমিক শিক্ষানুরাগী মানুষের হাত ধরে একটি অজপাড়াগাঁয়ে গড়ে ওঠে আমাদের এই "তিতাস গণগ্রন্থাগার"।

"তিতাস গণগ্রন্থাগার"-এর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস: সময়টা ছিলো ২০২০ সালের মে কিংবা জুন মাস। তখন পুরো দমে কোভিড-১৯ চলছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সবকিছু বন্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়-পড়ুয়া সকলের গ্রামে অবস্থান। স্কুলকলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের পরিসর দিন দিন বেড়েই চলছে। এর ফলে বাড়িতে থাকা প্রতিটা শিক্ষার্থীর মনে অনীহা জন্ম নিচ্ছে। তারই ফলে কেউ কেউ নেশায় আসক্ত হচ্ছে আবার কেউবা বিভিন্ন খারাপ কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। এসব কিছু বিশ্ববিদ্যালয়-পড়ুয়া সচেতন ছাত্র হিসেবে আমাদের প্রচণ্ড বেদনা দেয়। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা উদ্যোগ নেই গ্রামে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিবো। একমাত্র শিক্ষার আলোই পারে মানুষকে সচেতন করতে। এই শিক্ষাই পারে মানুষের বিষণ্ন মনকে উচ্ছ্বসিত করতে। এই শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার অন্যতম মাধ্যম হলো লাইব্রেরি। একটি লাইব্রেরি-ই পারে একটি সমাজ, একটি গ্রাম তথা একটি রাষ্ট্রকে আলোকিত করতে। আর তখনই আমরা চারজন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এএইচ বাবলু, সরকারি কবি নজরুল কলেজের রবিউল হাসান মুরাদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আব্দুর রহমান এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরিফুল ইসলাম) একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ হই। আমাদের এই কাজকে সর্বদা ত্বরান্বিত করেছেন এই লাইব্রেরির শ্রদ্ধেয় উপদেষ্টা জনাব শাওন চৌধুরী। তার দিকনির্দেশনা নিয়েই আমরা এগিয়ে যাই। এই এগিয়ে যাওয়ার সারথি ছিলো গ্রামের চাকুরিজীবী ও দেশের বাইরে থাকা মানুষগুলো, যারা আমাদেরকে মানসিক এবং আর্থিকভাবে সর্বদা সাহায্য করে গিয়েছেন। আর তাদের সকলের প্রচেষ্টায় আমরা তখন গড়ে তুলি আমাদের সবার প্রিয় এই "তিতাস গণগ্রন্থাগার"।

গ্রন্থাগারের নামকরণ: নদীমাতৃক বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী তিতাস বিধৌত স্বর্ণগর্ভা জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া। শিল্প-সাহিত্যে সঙ্গীতে সমৃদ্ধ এই জেলাটি বাংলাদেশের সংস্কৃতির রাজধানী নামে খ্যাত। আবহমান কাল থেকেই তিতাস নদী এই অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই তিতাস নদীর নামের অনুকরণে এই গণগ্রন্থাগারটির নামকরণ করা হয়েছে 'তিতাস গণগ্রন্থাগার'।

গণগ্রন্থাগারের অবস্থান ও কার্যক্রম: ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত নবীনগর উপজেলার কাইতলা উত্তর ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রামে অবস্থিত। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারে ১৫০০র বেশি বই আছে। একইসাথে ১৫-১৭ জন পাঠক এখানে একসাথে বসে বই পড়তে পারেন।

শিক্ষার পাশাপাশি এই গ্রন্থাগার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে থাকে। যেমন:

- দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদদের দ্বারা প্রোগ্রাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের দ্বারা স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষণীয় সেমিনার, প্রতিযোগিতা এবং বই পড়ার আগ্রহ বাড়িয়ে তোলার বিভিন্ন পদক্ষেপ।
- সামাজিক কার্যক্রমেও এই গ্রন্থাগার অবদান রেখে চলেছে। বাৎসরিক বৃক্ষ রোপণ, বর্জ্য পরিষ্কার, সচেতনতামূলক প্রচারণা এবং আর্থিক সংকটে থাকা ছাত্রছাত্রীদের বইখাতা প্রদান করার মাধ্যমে অবদান রেখে চলেছে।
- পাশাপাশি খেলাধুলার আয়োজনও করে থাকে এই গণগ্রন্থাগার যা গ্রামে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

"তিতাস গণগ্রন্থাগার" সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের আওতায় রেজিস্ট্রেশনকৃত। সরকারি দিকনির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম পালন করে থাকে এই গ্রন্থাগার।

"তিতাস গণগ্রন্থাগার"-এর লক্ষ্য হলো গ্রামের প্রতিটা মানুষের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়া ও সমাজের স্কুলকলেজে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ পথ সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে শিক্ষণীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা। এই গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মানুষের জন্য কাজ করে আসছে এবং এর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আরো অনেক দূর এগিয়ে যাওয়াই হলো 'তিতাস গণগ্রন্থাগার' এর মূল লক্ষ্য।

*লেখক: শিক্ষার্থী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ*

# নপম গ্রন্থাগার

রেজাউল করিম শেখ ও আরিফুল ইসলাম

গ্রন্থাগার হলো জ্ঞানার্জনের পীঠস্থান। যুগ যুগ ধরে মানুষের অস্তিত্বের ইতিহাস গ্রন্থাগারেই সংরক্ষিত আছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্যতাগুলোর পেছনেও গ্রন্থাগারের ভূমিকা সুবৃহৎ। গ্রন্থাগার অর্থ যেখানে বই সংগ্রহ করে রাখা হয়। যেখান থেকে পাঠক বই পাঠ ও সংগ্রহ করতে পারে। একটি জাতি বা দেশ ও সভ্যতার রীতিনীতি বা কৃষ্টি-কালচারের ধারক-বাহক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। প্রাচীন-বর্তমানের মেলবন্ধন গড়ে তোলা গ্রন্থাগারেই দেখা মেলে মহামানবদের। যদি আমরা পাঠাগারকে একটি খেয়ার সাথে তুলনা করি তাহলে এটি এমন একটি খেয়া যেটায় চড়ে আমরা মহাকালিক ভ্রমণে বেরুতে পারি। সক্রেটিস, প্লেটা, অ্যাডাম স্মিথ বা শেক্সপিয়ার, মিল্টন বা শেলি যে কারো কাছে আমরা চলে যেতে পারি পাঠাগারের টেবিলে বসে। একজন মানুষের মানসিকতার উন্নতির জন্য পাঠাগারে যাওয়াটা বাঞ্ছনীয় বলে আমি মনে করি।

**গ্রন্থাগারের ইতিহাস**

গ্রন্থাগারের ইতিহাস অনেক পুরাতন। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া, ইরাকের বাগদাদ, দামেস্কো, প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সভ্যতায় গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। পৃথিবীর বিখ্যাত সব গ্রন্থাগারের নাম বলতে গেলে সর্বপ্রথমে আসে লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের কথা। এটি সারা পৃথিবীর সব থেকে বড় গ্রন্থাগার। যা আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত। লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামও বিখ্যাত লাইব্রেরিগুলোর মধ্যে অন্যতম। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বডলিন লাইবেরিতে রয়েছে প্রায় এক কোটিরও বেশি গ্রন্থ। এছাড়াও পৃথিবীতে প্রাচীনতম গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে রয়েছে বিবলিওথিক লাইব্রেরি, ভ্যাটিকান লাইব্রেরি, মস্কোর লেনিন লাইব্রেরি এবং কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি। আমাদের উপমহাদেশে যে সমস্ত গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে তার মধ্যে তক্ষশীলা ও নালন্দা উল্লেখযোগ্য। আব্বাসীয় ও উমাইয়া শাসন আমলে 'দারুল হিকমা' নামক গ্রন্থাগার ইউরোপকে ব্যাপকভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাচুর্য দিয়েছিল। আপনারা হয়তা দ্বিমত পোষণ করবেন না যে সমকালিন সময়ে মিশরের বাইতুল হিকমাও অনুরূপ ভূমিকা পালন করছে। তৎকালীন সময়ে গ্রন্থাগারগুলো গড়ে উঠেছিল রাজদরবার ও ধর্মীয় উপাসনালয়কে ঘিরে। তবে আধুনিক যুগ শুরুর আগে থেকেই এর প্রভাব অনেকটা কমে যায়। ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার বা পারিবারিক গ্রন্থাগারও গ্রন্থাগার সংস্কৃতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রন্থাগার গড়ে তোলাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সে কাজ অনেক দেশে হয়নি আর অনেক দেশে আরম্ভ হলেও সকল মানুষের জন্য সেটি এখনও সহজলভ্য হয়ে ওঠেনি।

**পাবনা জেলার সাগরকান্দিতে গ্রন্থাগার**

এই জনপদের একটি ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে। এ মাটিতে মানে সাগরকান্দির মাটিতে জন্ম নেওয়া অনেক মানুষ কিংবদন্তিতুল্য জীবনযাপন করে গেছেন। শিক্ষাদীক্ষায় তাঁদের সুমহান ছাপ তাঁরা রেখে গেছেন। গ্রন্থাগারেরও ইতিহাস নবীন নয়। শতবর্ষ আগে শ্যামসুন্দরপুরে ছিলো আঞ্জুমানে নওজোয়ান লাইব্রেরি আর নিকট দূরে–নব্বইয়ের দশকে তালিমনগর গ্রামে গড়ে ওঠে তালিমনগর গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার। ২০০৪ সালে গোবিন্দপুরে গড়ে উঠেছিলো হাজি কিতাব উদ্দিন মোল্লা গণগ্রন্থাগার–যার অবস্থান ছিলো সাগরকান্দি রিয়াজ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের আঙিনায়। জ্ঞানরাজ্যের পথে চলার জন্য জনগণের উদ্যোগ এ দফায় শেষ হয়। এরপরে আসে ব্র্যাক গ্রন্থাগার প্রজেক্ট–সাগরকান্দি রিয়াজ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে। শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের অনুদান, শিক্ষার্থীদের চাঁদা ও ব্র্যাকের সহায়তায় বিপুল সংখ্যক বই নিয়ে স্কুলে গ্রন্থাগার চালু হলে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিপুল উৎসাহ জাগে।

**নবজাগরণ পাঠক মেলা**

নপম মানে 'নবজাগরণ পাঠক মেলা'। যার পথচলা শুরু ২০১১ সালের ১৩ জুন। পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলাধীন সাগরকান্দিতে জন্ম নেওয়া ও বেড়ে ওঠা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে নপম নানাবিধ সামাজিক সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে সচেষ্ট থেকে সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়নে কাজ করতে করতে জনপ্রিয় সমাজকল্যাণ সংস্থায় পরিণত হয়েছে। স্থানীয় সম্ভাবনা ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে মানবিক মর্যাদা ও মানব-সম্পদ উন্নয়নেও প্রভূত ভূমিকা রাখছে সংস্থাটি। বাংলা ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য চর্চার ভেতর দিয়ে একটি সুবোধসম্পন্ন প্রজন্ম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কল্যাণমুখী কর্মপ্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে নপম। বইমেলা ও সৃজনশীল মেধা বিকাশের প্রতিযোগিতা আয়োজন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা, রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা ও রক্তদাতা সমিতি গঠন, গ্রন্থাগার স্থাপন, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইত্যাদি নানাবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে এলাকা ও দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে এ সংস্থা। বেকারত্ব দূরীকরণ ও নতুন নতুন সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সমূহ পরিকল্পনাও করা হচ্ছে বর্তমানে।

বাংলা ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য চর্চার ভেতর দিয়ে একটি সুবোধসম্পন্ন প্রজন্ম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কল্যাণমুখী কর্মপ্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে নপম। বইমেলা ও সৃজনশীল মেধা বিকাশের প্রতিযোগিতা আয়োজন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা, রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা ও রক্তদাতা সমিতি গঠন, গ্রন্থাগার স্থাপন, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইত্যাদি নানাবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে এলাকা ও দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে এ সংস্থা। বেকারত্ব দূরীকরণ ও নতুন নতুন সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সমূহ পরিকল্পনাও করা হচ্ছে বর্তমানে

শুরুতে কোনো কক্ষ বা ঘর ছিলো না। উদ্যোক্তাগণ প্রতিদিন বিকেলে পত্রিকা ও বইগুলো নিজেরা হাই স্কুল মাঠে নিয়ে আসতেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর তা আবার নিয়ে যেতেন। ২০১২ সালে সাগরকান্দি বাজারে একটি কক্ষ ভাড়া করে সংগঠনের কার্যালয় খোলা হলে সদস্য ও শুভার্থীদের অর্থায়নে চেয়ার, টেবিল ও একটি বুকশেলফ নিয়ে সেখানেই পাঠাগার কার্যক্রম চালু থাকে। প্রতিদিন বিকেলে সদস্য ও শুভার্থীরা বই ও পত্রিকা পাঠের সুযোগ পান। পাশাপাশি বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পছন্দ মতো বই নিয়ে বাড়িতে পড়তে থাকে। এরপর ক্রমাগত সংগঠনের কর্মসূচি বৃদ্ধি পায়।

২০১৭ সাল হতে গ্রন্থাগার পুনর্গঠনে নজর ফেরানো যায়। এ পর্যায়ে সংগঠনের সকল সদস্য ও শুভার্থীদের জোর চেষ্টায় নতুন করে বই সংগ্রহ করা হয়। শুভার্থী জনাব মোখলেসুর রহমান একটি দৈনিক পত্রিকার যোগান দেওয়া শুরু করেন। বই ও পত্রিকা ওদের জায়গা পেলো নবনির্মিত নপম নির্বাহী কার্যালয়ের একটি কক্ষে। সদস্য, শুভার্থী, শিখা একাডেমিসহ অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং এলাকার সাধারণ জনগণ পুনরায় পাঠ শুরু করলো। নানান চড়াই-উৎরাই পার করে ২০২১ সালে আনুষ্ঠানিভাবে পাঠকক্ষের জন্য শিখা একাডেমির কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তন উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

বর্তমানে নপম উপদেষ্টা ফকির রহমত আলীর সৌজন্যে একটি পড়ার টেবিল, পূর্ব সংগ্রহসহ সভাপতি মহোদয়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহের প্রায় ৬০০ বইসহ ১০০০টিরও বেশি বই, শুভার্থী মোখলেসুর রহমান ও উপদেষ্টা খাইরুল ইসলামের সৌজন্যে ১টি করে মোট ২টি জাতীয় দৈনিক এবং বিভিন্ন সাময়িকী নিয়ে এই গ্রন্থাগার কার্যক্রম চলছে। দৈনিক পত্রিকার পাঠক গড়ে ২০জন, বইয়ের পাঠক গড়ে ২৫ জন এবং প্রতি মাসে গ্রন্থাগার থেকে বই নিয়ে পড়ছেন গড়ে প্রায় ৫০ জন পাঠক।

এই কার্যক্রমকে পুনরায় বেগবান করার সমূহ চেষ্টা করে যাচ্ছে সংগঠন। নপম বিশ্বাস করছে, গ্রন্থাগারে পাঠাভ্যাসের মাধ্যমে যেমন জ্ঞানার্জন হবে তেমনি নিয়মিত পাঠাগার ব্যবহার যুব সমাজকে বিপথগামী হওয়া থেকে এবং মাদক, সন্ত্রাস ও সমাজ-রাষ্ট্র বিরোধী ভয়াবহ অবক্ষয় হতে রক্ষা করবে।

*লেখক: রেজাউল করিম শেখ, প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, নপম*
*আরিফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, নপম*

# স্কাইলার্ক পথপাঠাগার ও আলোর পথযাত্রীদের কথা

অলোক আচার্য

পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার কাশিনাথপুরে স্কাইলার্ক ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের মূল ফটকের বাইরে রাস্তার পাশে গড়ে উঠেছে এই পাঠাগারটি। পাঠাগারটির যাত্রা শুরু হয়েছে চলতি বছরের জানুয়ারিতে। নাম স্কাইলার্ক পথপাঠাগার। পথপাঠাগারটি স্থানীয় স্কাইলার্ক স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও বেড়া উপজেলার মাশুমদিয়া ভবানিপুর কেজিবি ডিগ্রি কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক আলাউল হোসেনের একটি অভিনব উদ্যোগ। তিনি শিক্ষকতার বাইরেও একজন কবি ও গীতিকার। তিনি তার ব্যক্তিগত সংগ্রহের ১০০টি বই দিয়ে লাইব্রেরিটি শুরু করেন। শুরুর পর থেকেই লাইব্রেরিটি এলাকায় অভূতপূর্ব সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছে। যারা বইপড়ুয়া তারা এতদিন বইয়ের সুবিধাজনক প্রাপ্তির অভাবে বই পড়তে পারছিলেন না। এখন তারা এখান থেকে অনায়াসে বই সংগ্রহ করে পড়ছেন। আবার নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়ে যারা এতদিন অবসর সময় কাটিয়েছে মোবাইলে অথবা অন্যকোনোভাবে, তারাও এখন বইমুখী হচ্ছে। লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার সফলতা মূলত এখানেই।

এই লাইব্রেরি কেন অন্য লাইব্রেরি থেকে আলাদা তার পেছনে কারণ হলো এখানে যেকোনো পথচারী রেজিস্টারে নিজের নাম ঠিকানা আর ফোন নাম্বার লিখে নিজের ইচ্ছেমতো বিনামূল্যে বই নিতে পারেন। পড়ার পর বইটি ফেরত দিলেই চলে। দেশের বাইরে এমন উদ্যোগ চোখে পড়লেও আমাদের দেশে এ উদ্যোগ সত্যিই বিরল উদাহরণ। পথপাঠাগারটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে অনেকেই বই দিয়ে এটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। এগিয়ে এসেছেন কিছু সৃজনশীল

ও পাঠাগারপ্রিয় মানুষ। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো প্রতিষ্ঠার পাঁচ দিনের মধ্যেই পাঠাগারটির বই পাঁচ শতাধিক ছাড়িয়ে যায়। অনেকেই নিজের সংগ্রহের বই দিয়ে পাঠাগারটি সমৃদ্ধ করছেন। সবার সহযোগিতায় এখন পাঠাগারটিতে বইয়ের সংখ্যা হাজারে পৌঁছেছে। প্রতিনিয়তই সমৃদ্ধ হচ্ছে এই পথপাঠাগার।

পাঠাগারের উদ্যোক্তা আলাউল হোসেন জানান, 'মানবজীবনের ব্যর্থতা, শূন্যতা ও হতাশা থেকে পরিত্রাণের কোন উপায়ই নেই একমাত্র বইপড়া ছাড়া। আমাদের সময় একাডেমিক লেখাপড়ার পাশাপাশি ভাল গল্পের বই পড়ে অথবা খেলাধূলা করে সময় কাটাতো অধিকাংশ শিক্ষার্থী। এখন সেই জায়গা দখল করেছে ফেসবুক, স্মার্ট ফোন, ইন্টারনেট, ইউটিউব প্রভৃতি। এতে শিক্ষার্থীদের মননশীল চর্চা একেবারেই কমে গেছে। ফেসবুক, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ইউটিউবসহ সব সামাজিক মাধ্যমগুলোর অবাধ অপব্যবহার এই প্রজন্মকে অসহনশীল, অশালীন, অমার্জিত এমনকি অসামাজিক করে গড়ে তুলছে। নতুন প্রজন্মকে এই পথ থেকে ফেরানোর একটাই উপায়–বইপড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। পঠন-পাঠন ছাড়া তরুণদের মাঝে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা যাবে না। এই দিক বিবেচনায় আমি পথপাঠাগারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।'

তিনি আরও বলেন, 'প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত দুই শতাধিক নিয়মিত পাঠক পেয়েছি। যারা একেকজন কমপক্ষে ৮-১০টি করে বই এই পথপাঠাগার থেকে নিয়ে পড়েছে।'

সুজানগর উপজেলার তালিমনগর হাইস্কুল এন্ড কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক মাসুদ রানা। তার বাড়ি কাশিনাথপুর থেকে

প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে। প্রতি সপ্তাহে তিনি এই পাঠাগারে আসেন ও এখান থেকে বই নিয়ে যান। পড়া শেষ হলে পুরোনো বই জমা দিয়ে আবার নতুন বই নিয়ে যান। মাসুদ রানার সাথে কথা বললে তিনি বলেন, বইপড়া আমার নেশা। শিক্ষার্থীরা প্রাইভেট পড়তে চায়, কিন্তু পড়াই না। বইপড়ায় ব্যাঘাত ঘটবে বলে। তিনি বলেন, এ পর্যন্ত ৪০-৪৫টি বই পড়েছি এই পাঠাগার থেকে।

স্থানীয় কাশিনাথপুর আব্দুল লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণির ছাত্র আশরাফুল বলে, আমি পাঠাগারের পাশ দিয়েই প্রতিদিন স্কুলে যাতায়াত করি। প্রথম দিকে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম। এখন বই পড়া শুরু করেছি। এ পর্যন্ত ৫টি বই পড়েছি। জাফর ইকবাল স্যারের সায়েন্স ফিকশন পড়তে ভালো লাগে। এখন আর ফেসবুক আমাকে আকৃষ্ট করে না।

স্কাইলার্ক ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থী রিওনা ও প্রত্যয় জানায়, গল্পের বই পড়ার মধ্যে এত আনন্দ আছে আগে বুঝিনি। এই পাঠাগার আমাদের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

স্থানীয় কামরুজ্জামান ল্যাবরেটরি স্কুলের ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থী লামিয়া তাবাসসুম বলে, প্রতিদিন ২ পৃষ্ঠা হলেও গল্পের বই পড়বো। এই পাঠাগার থেকেই আমার বই পড়ার শুরু। নিয়মিত পড়তে চাই।

শিক্ষার্থীরা বই পড়ছে, অনেক অভিভাবক খুশি। জাফরুন্নাহার শেলী নামের এক অভিভাবক বলেন, আমার মেয়ে চলতি বছরে এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। পরীক্ষা শুরুর এক সপ্তাহ আগেও আমার মেয়ে গল্পের বই পড়েছে। আমি বাধা দেইনি। একমাত্র ভালো বই-ই পারে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে।

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. আমিনউদ্দিন মৃধা বলেন, পাঠাগারটি দেখতে আমি গিয়েছি। বিদেশে এমন পাঠাগার দেখা গেলেও বাংলাদেশে এমন উদ্যোগ বিরল। অদ্ভূত সুন্দর এক পরিবেশ। আমি সত্যিই

পাঠ্য বইয়ের বাইরে বই পড়ার জন্য পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে মোবাইলে ইন্টারনেট দেখা গেলেও যেখানে সেখানে বই পড়া যায় না। একটি সুন্দর সুষ্ঠু পরিবেশ এবং বইয়ের বৈচিত্র্য প্রয়োজন

অভিভূত। আগামীতে পাঠাগারটির পরিসর আরও বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছি। আমিও আমার সহায়তা অব্যাহত রাখবো।

বিশিষ্ট টিভি অভিনেতা কাজী আনিসুল হক বরুণ বলেন, পাঠাগার চত্বরে আমি গিয়েছি, ক্ষুদে পাঠকদের সাথে কথা বলেছি। বইপড়া শুরু করেছে মানেই ওরা স্বপ্ন দেখতেও শুরু করেছে। পাড়ায়-মহল্লায় এমন করে পাঠাগার গড়ার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অন্যথায় এ জাতির মুক্তি মিলবে না।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহবুব রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সৈকত আরেফিন, প্রথম আলোর সাবএডিটর মেহেদী হাসান রোমেল, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মনিরুজ্জামান সুমন, ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের কোষাধ্যক্ষ খায়রুজ্জামান কামাল, লেখক ও গবেষক অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল মোহনসহ অনেক গুণী মানুষের পদচারণায় ইতিমধ্যে পাঠাগারটি ঋদ্ধ হয়েছে বলে জানান উদ্যোক্তারা।

বইপড়া আন্দোলন বেগবান করতে বড় সমস্যা হলো পর্যাপ্ত বই। মুক্তবুদ্ধি চর্চার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা প্রয়োজনীয় বই পাওয়ার অভাব। অর্থাৎ হাতের কাছে যদি বই না পাওয়া যায় তাহলে আমার পড়ার সুযোগ তৈরি হবে কিভাবে? টাকা দিয়ে সবাই কিনে বই পড়ে না। সবার সামর্থ্যও থাকে না। বিশেষ করে স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীদের। আলাউল হোসেনের এই পথপাঠাগারে ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বই এসেছে। আরও বহু মানুষ বই পাঠানোর জন্য যোগাযোগ করছে। এই পাঠাগারটির দায়িত্ব রয়েছে কয়েকজন মানুষের হাতে। সাথে শিক্ষার্থীও রয়েছে।

এবার আসি একটি পাঠাগার বা লাইব্রেরি ঠিক কেন প্রয়োজন বা বই পড়তে কেন লাইব্রেরির প্রয়োজন হবে সে আলোচনায়। স্কুলকলেজের বইয়ের বাইরে বই পড়ছে বা আগ্রহ দেখাচ্ছে এ সংখ্যা আজ হাতে গোণা। মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা অধিকাংশই পাঠ্য বইয়ের বাইরে বেশি একটা বই পড়তে পছন্দ করে না। অধিকাংশই মোবাইল ফোনে আসক্ত। প্রায় সবার হাতে হাতেই মোবাইল ফোন এবং চোখ দুটিও মোবাইলের পর্দায়। মোবাইল রীতিমত আসক্তির পর্যায়ে চলে গেছে। প্রশ্ন হলো বই পড়তে অনীহা বাড়ছে কেন? পাঠ্য বইয়ের বাইরে বই পড়ার জন্য পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে মোবাইলে ইন্টারনেট দেখা গেলেও যেখানে সেখানে বই পড়া যায় না। একটি সুন্দর সুষ্ঠু পরিবেশ এবং বইয়ের বৈচিত্র্য প্রয়োজন। সবাই সব ধরনের বই পড়তে পছন্দ করবে না। ফলে প্রচুর বই হাতের কাছে থাকলে সেখান থেকে নির্বাচন করে বই পড়া যায়। আমাদের স্কুলকলেজের লাইব্রেরিগুলোতে যে পরিমাণ বই আছে তা যথেষ্ট নয়। একটি সুন্দর সাজানো গোছানো লাইব্রেরি মফস্বল অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমই দেখতে পাওয়া যায়। আলাউল হোসেনের এই স্কাইলার্ক পথপাঠাগারটি একদিন বইয়ের বিশাল সংগ্রহে ভরে উঠবে এ প্রত্যাশাই আমরা করি।

*লেখক: শিক্ষক ও কলামিস্ট*

# চিত্রগৃহ চাটমোহর পাঠাগার
## আমার উপলব্ধি

জেমান আসাদ

আমি লিখছি পাবনার চাটমোহর থেকে, যে মফস্বল শহরে পাঠাগার দূরে থাক, পড়ার জন্য ভাল বই কিনতেও পাওয়া যায় না! (নকশী নামে একটি দোকানে পাওয়া যায় মাত্র)।

ছোটবেলা থেকেই লাইব্রেরি নামে যে দোকানগুলো দেখেছি, সেগুলো মূলত কলম, খাতা আর গাইড বই বিক্রির দোকান।

একটা সময় "প্রিয়জনকে বই উপহার দিন" কথাটি বাণীর মত প্রচার হতো। কথা হলো, প্রিয়জনকে বই উপহার দিবেন কি করে, যদি বই কেনার মত কোন দোকানই না থাকে?

মফস্বল শহরের এই বাস্তবতায়, পাঠাগার কল্পনা করা কঠিন। কিছু আছে সৌখিনতার শোপিস হয়ে।

অনেক বছর হলো নিজে একটা পাঠাগার করার চিন্তা করছিলাম। এটা কোন মহৎ ভাবনা থেকে নয় বরং বিরূপ সামাজিক বাস্তবতায় অন্তত নিজের জন্য হলেও।

সমস্যা হলো, পাঠাগার করতে একটা ঘর লাগবে। সেটার ভাড়া কোথা থেকে আসবে? প্রতিদিন সময়মত একজন লোক পাঠাগার পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত খুলে রাখবে, তার সম্মানি কোথা থেকে আসবে?

এসব চিন্তায় বারবার পিছিয়ে গেছি। সৌভাগ্যক্রমে ২০২০ সালে চাটমোহরে শিশুদের শিল্পবোধ শাণিত করতে 'চিত্রগৃহ চাটমোহর' নামে একটি শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করি। যেখানে শতাধিক শিশু-কিশোর ছবি আঁকা, নাচ, গান, আবৃত্তি, নাটক, হাতের লেখা শেখে।

নিজের একটা স্থান হলো, যেটা সপ্তাহে প্রায় প্রতিদিনই নির্দিষ্ট সময়ে খোলা হয়। তাই পাঠাগার করার জন্য আর কোন বাধা রইলো না।

অনেকে বললেন, এখন কি আর কেউ বই পড়ে? কেউ বই পড়বে?

সত্যি বলতে, আমার মনেও যে সন্দেহ ছিলো না তা না। আমি তো নিজেকে দিয়ে দেখি, অনলাইন আসক্তি তো আমার নিজেরই বই পড়ার মনোযোগ কেড়ে নিচ্ছে।

তবুও ক্ষীণ সম্ভবনা নিয়ে ৪ আগস্ট '২২এ চিত্রগৃহ চাটমোহর পাঠাগার শুরু করলাম। নিজের এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে বই যোগাড় হলো ৬২১টি।

তারপরের বাস্তবতা, একরাশ মুগ্ধতার এবং সময় ও সমাজ নিয়ে আশাবাদী হবার কারণ।

শুরুর ৪০ দিনে পাঠাগার থেকে নাম, ঠিকানা এন্ট্রি করে বই নিয়েছে ১০১ জন, যাদের মধ্যে ৪৮ জন পড়ে ফেরত দিয়েছে।

একটি কথা বলা হয়নি। আমি পাঠাগার শুরু করেছিলাম একসাথে দুটি। যেহেতু চিত্রগৃহ চাটমোহর সবসময় খোলা থাকে না। কোন পাঠক যে কোন সময় এসে যেন বই পড়তে পারে, সেজন্য প্রতিষ্ঠানের বাহিরে ২৪ ঘন্টাব্যাপী একটি উন্মুক্ত পাঠাগার করেছিলাম। যেখানে রেখেছিলাম ১০০টি বই।

আমার শুভাকাঙ্ক্ষীরা এটার বিরোধিতা করেছিলো সবচেয়ে বেশি! বলেছিলো, বই তো সব হারায়ে যাবে। পড়ার জন্য বই নিয়ে বন্ধুরাই ফেরত দেয় না, আর এখান থেকে তো সরকারি মাল মনে করে সকলে বই নেবে।

আমি হেসে বলেছিলাম, মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। বিশ্বাসের শক্তিতেই সকলে বই নেবে এবং পড়ে ফেরত দেবে। চিত্রগৃহ চাটমোহরে শতাধিক বাচ্চা আসে, এটা তাদের জন্য মানুষের ওপর ভরসা রাখার শিক্ষা।

তারপর শুরুর ৪০ দিনে বাহির থেকে ৮৩টি বই নাই! বই নাই বলতে, অজ্ঞাত পাঠকেরা নিয়ে গেছেন। আমি নিয়মিত বইগুলো চেক করি, নেয়া বইগুলো ফেরত আসছে না। ৪০ দিন সময় হিসাবে পাঠাগার থেকে বই নিয়ে পড়ার জন্য লম্বা সময়। এ সময়ের মধ্যে ফেরত না আসা দুঃখজনক। এটা আমাকে হতাশ করছে।

তবে আমি এখনি হাল ছেড়ে দিচ্ছি না। আমি ঝুঁকি নেবো। আরো ৬৭টি বই আমি বাহিরে দেবো। আমি এখনো মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখতে চাই। সব হারিয়ে গেলে তখন হয়তো আমাকে উন্মুক্ত পাঠাগার থেকে সরে আসতে হতে পারে।

তবে বই হারালেও এটা মুগ্ধ করার একটা উপলক্ষ যে, বই পড়ার পাঠক এখনো আছে। আপনি যে শহরেই থাকেন, সমাজ নিয়ে যত হতাশাতেই ভোগেন, এটা জেনে রাখুন, বই পড়ার মত সুযোগ তৈরি করে দিলে মানুষ এখনো বই পড়বে।

পাঠাগার করার আগে এই উপলব্ধিটা আমার আসেনি।

## একজন সমাজব্রতী শিক্ষক

# গোলাম রসুল স্যার

**আশেক মাহমুদ সোহান**

১৯৭১ সালে স্কুলের কাজে রাজশাহী যাওয়ার পথে নাটোরে তাঁকে হানাদার বাহিনী আটক করে, সার্চ করার সময় তাঁর পকেট থেকে একটি কলম ছিনিয়ে নিয়ে এক পাকহানাদার বলে, "এ মেরা জরুরত হ্যায়!"

স্যার রাগান্বিত সুরে বলেন, "এ মেরা জাদা জরুরত হ্যায়! (ওর রাইফেলে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করেন) এ কেয়া হ্যায়?"

হানাদার বলল, "এ হাতিয়ার হ্যায়।"

স্যার বলেন, "কলম মেরা হাতিয়ার হ্যায়।"

অসীম সাহসী, বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক এই মানুষটির নাম গোলাম রসুল। ১৯৪৫ সালের ১৫ মার্চ পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার চরদুলাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম ডা. মহসীন উদ্দিন, মাতা নুরজাহান বেগম। শিক্ষা জীবনের শুরুতে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন চরদুলাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। এরপর ক্লাস সিক্সে চলে যান ময়মনসিংহ শহরে । সেখানে মৃত্যুঞ্জয় উচ্চ বিদ্যালয়ে দুই বছর লেখাপড়া করেন। ছোটবেলায় বাবা হারানোর পর তাঁর পড়াশোনা ও থাকা-খাওয়ার যোগান দিতেন তাঁর এক ভাই। তবে ভাইয়ের সরকারি চাকরির নিয়মিত বদলি হওয়ার ফলে শিক্ষাজীবনে তাঁকে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বদলাতে হয়। অষ্টম শ্রেণিতে তিনি রাজবাড়ি রাজা সূর্যকুমার ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন এবং নবম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। সেইসময় তিনি চরদুলাই থেকে হেঁটে নাজিরগঞ্জ যেতেন এবং নদী পার হয়ে রাজবাড়ি যেতেন ।

পল্লীগ্রামের মা ও শিশুর চিকিৎসায় ভালো কোনো প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত। ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন পল্লীশিশু ক্লিনিক নামক একটি প্রতিষ্ঠান যা বর্তমানে সূর্যের হাসি ক্লিনিক হিসেবে ঢাকার একটি এনজিও পরিচালনা করছে। গত ৪০ বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানটি লক্ষাধিক মানুষকে চিকিৎসা প্রদান করেছে

তাঁর নেতৃত্ব দেওয়া শুরু হয় রাজবাড়ি আর. এস. ইনস্টিটিউশন থেকেই। নবম শ্রেণিতে স্কুল ছাত্রসংসদ নির্বাচনে তিনি বিপুল ভোটে জিএস নির্বাচিত হন। তখন থেকে তিনি নাট্যদলে অভিনয় ও আবৃত্তি শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত প্রায়শ্চিত্ত নাটকে তিনি বৈরাগীর পাঠ করতেন। এ সময় তিনি মহাবিপদে পড়েন, তাঁর ভাই ফরিদপুর বদলি হয়ে যান। তিনি বেশ কয়েকদিন রেলস্টেশনে রাত কাটান, পরবর্তীতে হেডমাস্টারের বাড়িতে আশ্রয় পান। তবে লেখাপড়ার পরিবেশ না থাকায় তিনি দুইমাস পর টিসি নিয়ে ফরিদপুর জেলা স্কুলে ভর্তি হন এবং এখান থেকেই ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর ঐতিহ্যবাহী পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে আইএ ও বিএ পাশ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় মাস্টার্সে ভর্তি হয়েছিলেন কিন্তু পড়া শেষ করতে পারেননি। ১৯৬৬ সালে লেখাপড়া শেষ করে গ্রামে ফিরে যান।

ছোটবেলা থেকেই রসুল স্যার সামাজিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। স্কুলজীবনেই এলাকায় একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। লেখাপড়া শেষে বাড়ি ফেরার পর এলাকার লোকজন তাঁকে অনুরোধ করলো একটা হাইস্কুল করতে। তখন এ অঞ্চলে কোনও হাইস্কুল ছিল না। তিনি সকলের অনুরোধে তৎকালীন দুলাই ইউনিয়ন পরিষদের বীজাগারে ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে ১৯৬৭ সালের জানুয়ারিতে দুলাই উচ্চ বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করেন। ১৯৭১ সালে প্রায় ১ বছর শিক্ষাকার্যক্রম বন্ধ থাকার সময়েও

১৯৭১ সালে প্রায় ১ বছর শিক্ষাকার্যক্রম বন্ধ থাকার সময়েও তিনি স্কুলের কাজে পাবনা জেলা শহর ও রাজশাহীতে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। সেসময় তাঁকে বহুবার হানাদার বাহিনীর সম্মুখে পড়তে হয়। বেশ কয়েকবার মৃত্যুর মুখ থেকে তিনি ফিরে এসেছেন। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্রের যোগান দিয়েছেন তিনি। তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নেন পাবনার বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বকুল, জহিরুল ইসলাম বিশু, করিমসহ আরো অনেকে। একদিন মিলিশিয়া বাহিনী এসে গুলি করা শুরু করলে তাঁর ভূমিকায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণ রক্ষা পায়

তিনি স্কুলের কাজে পাবনা জেলা শহর ও রাজশাহীতে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। সেসময় তাঁকে বহুবার হানাদার বাহিনীর সম্মুখে পড়তে হয়। বেশ কয়েকবার মৃত্যুর মুখ থেকে তিনি ফিরে এসেছেন। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্রের যোগান দিয়েছেন তিনি। তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নেন পাবনার বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বকুল, জহিরুল ইসলাম বিশু, করিমসহ আরো অনেকে। একদিন মিলিশিয়া বাহিনী এসে গুলি করা শুরু করলে তাঁর ভূমিকায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণ রক্ষা পায়।

এরপর মহান ১৬ই ডিসেম্বরে বিজয় অর্জন এবং ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে নিয়মিত স্কুলের কার্যক্রম শুরু হয়। কিছুদিনের মধ্যেই স্কুলটি অত্র অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ স্কুল হিসেবে পরিচিতি পায়।

১৯৭৩ সালে দুলাই ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিপুল ভোটে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৭ সালে দুলাই জনকল্যাণ ট্রাস্টের সাথে যুক্ত হন এবং পরবর্তীতে ট্রাস্টের সভাপতি ও পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। সেসময় এলাকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নে ট্রাস্ট বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। সেই বছর থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত নয় বছর পাবনা পল্লীবিদ্যুৎ সমিতি-২এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, মাঝে সেক্রেটারিও ছিলেন। এছাড়াও বেসরকারি সংস্থা সমতার পরিচালক যখন কারাগারে তখন দাতাগোষ্ঠীর অনুরোধে প্রায় ১ বছর অনারারি পরিচালক হিসেবে কাজ করেন।

এই এলাকায় তখন অনেক গর্ভবতী মা ও নবজাতকের মৃত্যু হতো বিনা চিকিৎসায়। তিনি চিন্তা করলেন পল্লীগ্রামের মা ও শিশুর চিকিৎসায় ভালো কোনো প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত। ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন পল্লীশিশু ক্লিনিক নামক একটি প্রতিষ্ঠান যা বর্তমানে সূর্যের হাসি ক্লিনিক হিসেবে ঢাকার একটি এনজিও পরিচালনা করছে। গত ৪০ বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানটি লক্ষাধিক মানুষকে চিকিৎসা প্রদান করেছে।

স্কুল করার পরপরই তাঁর একটি স্বপ্ন ছিল কলেজ করার। তিনি চাইতেন এমন একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করবেন যেটি থাকবে রাজনীতি-দলাদলির বাইরে। তাঁর আত্মীয়া তৎকালীন বাংলা চলচ্চিত্রের চিত্রনায়িকা ডা. রওশন আরা তার স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁকে অনুরোধ করেন একটি ওষুধের দোকান করে দিতে। তবে তখন স্যার ডা. রওশন আরাকে অনুরোধ করেন ওষুধের দোকান না করে কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে। তখন কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন ছিল, ডা. রওশন আরা অর্ধেক টাকা দেয়ার প্রস্তাব করেন। স্যার তখন বলেন, আপনি অর্ধেক টাকাই দিন, বাকি অর্ধেক আমি জোগাড় করব। কিন্তু কলেজ আপনার স্বামীর নামেই হবে, আমার কাজ দরকার, নাম না।

পরবর্তীতে তিনি ১৯৯৪ সালে দশ বিঘা জমি কিনে দুলাইতে ডাঃ জহরুল কামাল ডিগ্রী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। যা বর্তমানে সরকারি ডাঃ জহরুল কামাল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ নামে পরিচিত। এতো প্রতিষ্ঠানের প্রধান হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন সময় অর্থাভাবে তাঁর সংসার চলত না। তাই তিনি দুলাই চৌধুরি বাড়ি লিজ নিয়ে স'মিল, রাইসমিল করেন যা থেকে তিনি অর্থ উপার্জন শুরু করেন।

বর্তমানে তিনি কাশিনাথপুর ডিজিটাল স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। পারিবারিক জীবন থেকে সারাজীবনই সমাজউন্নয়নে বেশি সময় অতিবাহিত করেছেন। তিনি ছয় সন্তানের পিতা, তাঁর বড় ছেলে ব্যবসায়ী, মেজ ছেলে বিদেশে চাকুরিরত, সেজ ছেলে ঢাকায় একটি ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত এবং ছোট ছেলে কলেজে লেখাপড়া করছে। বড়মেয়ে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা এবং ছোটমেয়ে গৃহিণী।

এই অঞ্চলের মানুষের কাছে গোলাম রসুল নামটি প্রেরণা হিসেবে গত পঞ্চাশ বছর ধরে সকলের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। তিনি শতায়ু হউন এবং সুস্থসুন্দর জীবনযাপন করুন এই প্রত্যাশা রাখি।

## শতবর্ষী বিদ্যালয়

# ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

**অশ্রুজিত রায়**

হলুদাভ দালানের প্রতিটি ইটের পরতে পরতে লুকিয়ে আছে শিক্ষানুরাগী মহর্ষি রায়বাহাদুর অন্নদা বাবুর হৃদয় নির্যাস। পরবর্তী সময়ে ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে বিদ্যালয়টিকে 'অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়' হিসেবে জাতীয়করণ করা হয়

সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার উর্বর ভূমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে 'অন্নদা হাইস্কুল' নামে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তী সময়ে ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ১ মে তারিখে বিদ্যালয়টিকে 'অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়' হিসেবে জাতীয়করণ করা হয়। বর্তমানে এ বিদ্যালয়ে দুই শিফ্‌টে প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা হয়। ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত একতলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক হলুদাভ ভবন ছাড়াও এ বিদ্যালয়ে দুইটি দ্বিতল ও একটি এল আকৃতির ৪ তলা ভবন, টিনসেডের একটি হলরুম, জিমনেসিয়াম রয়েছে। এ ভবনগুলোতে শ্রেণি পাঠদান ছাড়াও পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত ও কম্পিউটার বিষয়ের ল্যাবরেটরি রয়েছে। যেখানে শিক্ষার্থীরা মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার করতে পারছে। বিদ্যালয়ের উত্তর পার্শ্বে অনতিদূরে একটি নিজস্ব বিশাল খেলার মাঠ রয়েছে। খেলার মাঠের পশ্চিমপার্শ্বে একটি পুকুর, একটি মসজিদ ও একটি ছাত্রাবাস রয়েছে। অতীতে দূর দূরান্তের শিক্ষার্থীরা এ ছাত্রাবাসে থেকে পড়ালেখা করার সুযোগ পেলেও বর্তমানে ছাত্রাবাসটি পরিত্যাক্ত অবস্থায় আছে। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটি একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। বিভিন্ন পর্যায়ের ৫ (পাঁচ) হাজারের অধিক বই এ গ্রন্থাগারে রয়েছে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইসহ বিভিন বই পড়ে ঐতিহ্যবাহী এ বিদ্যালয়ের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখছে। পড়ালেখার পাশাপাশি বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রম ও জাতীয় দিবস সমূহে এ বিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র, বিএনসিসি, স্কাউট ও যুব রেড ক্রিসেন্ট দল অংশগ্রহণ করে বিদ্যালয়ের ঐতিহ্যের ধারাকে আরও সামনের দিকে প্রবাহিত করছে।

**ইতিহাস:** সঙ্গীত ও সংস্কৃতির পাদপীঠ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার 'অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়' তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার একটি প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ বিদ্যালয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আপামর জনগণের বিনম্র অহংকার। ১৪৭ বছরের প্রবীণ জ্ঞানের এ বোধিবৃক্ষ তার হৃদয় থেকে লাখো আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করে উৎসারিত করেছে অপরিমেয় জ্ঞানরাজি যার দ্যুতিতে আলোকিত হয়েছে এ সমাজ, এ দেশ–সৃষ্টি করেছে অজস্র কীর্তমান কর্মবীরদের। এ বিদ্যালয় এতদ্‌অঞ্চলের মানুষদেরকে অন্ধকার আবর্ত থেকে শুধু আলোর পথেই নিয়ে আসেনি–ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে যোগ করেছে নতুন মাত্রা ও উপাদান।

মূলত ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে Aided Anglo Vernacular School হিসাবে অস্তিত্ব লাভের পর ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গ প্রদেশের কাশিম বাজারস্থিত সরাইল এস্টেটের স্বনামধন্য জমিদার রায় অন্নদাচরণ রায়বাহাদুরের উল্লেখযোগ্য দান ঘোষণার মাধ্যমে বিদ্যালয়টি 'অন্নদা হাইস্কুল' নামে আত্মপ্রকাশ করে। হলুদাভ দালানের প্রতিটি ইটের পরতে পরতে লুকিয়ে আছে শিক্ষানুরাগী মহর্ষি রায়বাহাদুর অন্নদা বাবুর হৃদয় নির্যাস। পরবর্তী সময়ে ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে বিদ্যালয়টিকে 'অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়' হিসেবে জাতীয়করণ করা হয়। তৎপরবর্তী থেকে বর্তমান অবধি বিদ্যালয়টি একটি পূর্ণাঙ্গ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে পরিচালিত হয়ে আসছে।

*লেখক: প্রাক্তন সহকারি শিক্ষক (বাংলা), অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়*

# আমার শিক্ষকতা জীবনের ৩৪টি বছর

## মো. জাকির হোসেন সরকার

শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর। শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। যারা শিক্ষকতাকে অন্তরে লালন করতে পারে তারাই আদর্শ শিক্ষক। অনেকেই মনে করে শিক্ষকতায় এখন আর আগের মতো সম্মান নাই। আসলে আমি মনে করি সম্মান নিজেকে অর্জন করতে হয়। আমি আমার ৩৪ বছরের শিক্ষকতা জীবনে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছি তা আমাকে অভিভূত করেছে। পৃথিবীর সবাই আমাকে সম্মান করবে এমন নাও হতে পারে।

আমি ১৯৮৮ সনের পহেলা অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার রতনপুর আব্দুল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম শিক্ষকতা শুরু করি। আমার ঐ স্কুলের ছাত্ররা আজ রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ পদে কর্মরত আছে। তারপর সেখান থেকে ১৯৯২ সনের পহেলা জানুয়ারি ঢাকার যাত্রাবাড়ী এলাকায় ধনিয়া আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে চলে আসি। মাত্র তিন-চার মাস ঐ স্কুলে ছিলাম। এই অল্প সময়ের মধ্যে স্কুলের ছাত্রীদের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন হয়ে উঠেছিলাম। সেখান থেকে চলে আসার সময় ছাত্রীদের চোখের জল আর শিক্ষকদের ভালোবাসার স্পর্শ আজও আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে তাদের ভালবাসায় কোথাও খাদ ছিল না। ছাত্রীদের দেওয়া উপহারসামগ্রী আজও আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

১৯৯২ সনের ১২ই এপ্রিল আমি যোগদান করি সিলেট জেলার কানাইঘাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে। আমার সাথে তোমাদের মনসুর আলী স্যার ও অশোক চক্রবর্তী স্যারও একই স্কুলে যোগদান করেন। সেখানেও আমি ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের অত্যন্ত প্রিয়জন ছিলাম। বিদায়বেলায় ছাত্রছাত্রীদের চোখের জল আজও আমাকে তাদের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়।

১৯৯২ সনের পহেলা অক্টোবর শুরু হলো

জীবনের নতুন অধ্যায়। সেদিন আমি আমার নিজ জেলার ঐতিহ্যবাহী সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগদান করি। বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকদের মধ্যে আমি ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ। তখন আমার বয়স মাত্র ২৪/২৫ বছর। ১৯৯৫ সনের জানুয়ারি মাসে তোমরা ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হলে। আমি তখন ৬ষ্ঠ গ শাখার শ্রেণিশিক্ষক। আমার যতটুকু মনে পড়ে বিদ্যালয়ের দক্ষিণ পাশে রসায়ন বিজ্ঞানাগারের দোতালায় তোমাদের ৬ষ্ঠ শ্রেণির গ শাখার ক্লাসটা ছিল। তার ঠিক পূর্ব পাশেই ছিল বাবু নৃপেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক স্যারের ৭ম শ্রেণির গ শাখার ক্লাস।

১৯৯২ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩০ বছর। এই ৩০ বছরে তোমাদের মতো প্রতিবছরই অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। এই স্কুলের প্রতিটি ধূলিকণার সাথে আমার পরিচয়। ভালবাসি আমি এই স্কুলকে। ভালবাসি আমি এই স্কুলের সকল ছাত্রশিক্ষককে। তোমাদের এসএসসি ব্যাচ ২০০০এর প্রায় সকল শিক্ষার্থীই ছিল অত্যন্ত মেধাবী। আমি তোমাদেরকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। ১৯৯৭ সনের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় তোমাদের ব্যাচের সাফল্য পূর্বের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে দেয়। অধিক সংখ্যক ছাত্র টেলেন্টপুল এবং সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছিলে। আমার যতটুকু মনে পড়ে তখন আমিই সর্বপ্রথম তোমাদের বৃত্তি রেজাল্ট তোমাদেরকে জানাই। তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে অনেক সময় শাসনও করেছি প্রচুর। আশা করি এখন এই পর্যায়ে এসে বুঝতে পারছো যে আমার এই শাসনের উদ্দেশ্য ছিল তোমাদেরকে মানুষের মতো মানুষ হিসাবে তৈরি করা। এসএসসি পরীক্ষায়ও তোমরা চমকপ্রদ রেজাল্ট করেছিলে। আজ তোমরা সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দিচ্ছ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, আইনজীবী হয়ে মানুষের সেবা করছো। এর চেয়ে বড় পাওয়া আমার জীবনে আর কী হতে পারে। এখানেই আমার শিক্ষকতা জীবনের সার্থকতা।

কয়েকদিন পূর্বে হঠাৎ একটা ফোন পেলাম। স্যার আমি আপনার ছাত্র মাহবুব উল আলম উজ্জল। ব্যাচ ২০০০। স্যার আমরা ঈদের পর একটা স্মরণিকা বের করবো। আপনার একটা লেখা চাই। তাই লিখতে বসলাম। তোমাদেরকে নিয়ে লিখলে শেষ হবে না। অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ব্যাচের মধ্যে এসএসসি ২০০০ ব্যাচের ছাত্রদের স্মৃতি আজও আমাকে আবেগোপ্লুত করে। প্রত্যেকের প্রতিচ্ছবি আজও আমার অন্তরে স্মৃতি হয়ে আছে। তোমাদের অনেকের নাম ও চেহেরা আজও আমার মনে আছে। আশা করি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত হয়তো মনে থাকবে ইনশাল্লাহ। কারণ তোমরা যে আমার আত্মার আত্মীয়।

পরিশেষে তোমরা পরিবার পরিজন নিয়ে ভাল থাকো আল্লাহপাকের নিকট এই কামনা করি। আমার জন্য তোমরা সকলে দোয়া করবে। আল্লাহপাক যেন আমাকে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করেন।

*লেখক: সিনিয়র শিক্ষক (গণিত), অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়*

## জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের

# ৪৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে

### ফলজ ও ঔষধি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা

১৫ আগস্ট জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষে সিদীপের সকল শাখায় বৃক্ষরোপণের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়। এ ছাড়াও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে সংস্থায় মাসব্যাপী পালিত হয় ফলজ ও ঔষধি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। যার অংশ হিসেবে পাবনা জেলার ভাঙ্গুরা শাখার আওতায় ১৬ই আগস্টে সরকারি ভাঙ্গুরা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় কুটি শাখার আওতায় ২১ আগস্টে কুটি অটলবিহারী উচ্চ বিদ্যালয়ে, ২৫ আগস্টে নয়নপুর শাখার আওতায় রাবেয়া মান্নান উচ্চ বিদ্যালয়ে, ২৭ আগস্টে নাটোরে সিংড়া শাখার আওতায় দমদমা পাইলট স্কুল এণ্ড কলেজে এবং ২৮ আগস্টে নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার শাখার আওতায় রোকনউদ্দিন পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে সর্বমোট ৫০০টির বেশি ফলজ ও ঔষধিবৃক্ষ বিতরণ ও রোপণ করা হয়।

ভাঙ্গুরা ইউনিয়ন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভাঙ্গুরা উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ নাহিদ হাসান খান সিদীপের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি সুন্দর মনমানসিকতা গড়নে ছাত্রজীবনে বাগান করা, গাছ লাগানো ও পরিচর্যা করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন এবং সকলকে গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। প্রধান শিক্ষক জনাব রফিকুল ইসলাম শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বৃক্ষরোপণ নিয়ে গঠনমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তার বক্তব্যে বৃক্ষের সাথে অক্সিজেনের সম্পর্ক, গ্লোবাল ওয়ার্মিংসহ দেশের ঋতুপরিবর্তনের নানাদিক উঠে আসে। প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকশিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রী অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে এ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে।

একইসঙ্গে মাসব্যাপী সিদীপের কর্ম-এলাকায় সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে

স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্য উপকরণ এবং চিকিৎসা উপকরণ বিতরণ করা হয়। গোপালপুর (লালপুর), রাজাপুর ও মুন্সিগঞ্জ সদর শাখায় বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা এবং চশমা বিতরণও করা হয়। সিদীপের স্বাস্থ্যকর্মীগণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবার আয়োজন পরিচালনা করেন। কর্ম-এলাকায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টি প্রচার করার ফলে সকাল থেকেই সাধারণ মানুষ এসব স্বাস্থ্যক্যাম্পে ভিড় জমাতে থাকেন। গোপালপুর (লালপুর) শাখায় লালপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব শামীমা সুলতানা, রাজাপুর শাখায় বড়াইগ্রাম উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মারিয়াম খাতুন এবং মুন্সিগঞ্জ শাখায় মুন্সিগঞ্জ জেলার ডিসি ল্যান্ড জনাব হাফিজুর রহমান উপস্থিত থেকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা উদ্বোধন করেন। স্থানীয় পত্রপত্রিকায় সিদীপের এই বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবার সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

# শুধু নারী না, মানুষ ...


## বি. এন. নাজমুন আমীন

এ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (স্পেশাল প্রোগ্রাম), সিদীপ




কী আনন্দ! এ ঘরে আজ ফুটফুটে একটি সন্তান হয়েছে!
মাগো, এ যে আমার কন্যাসন্তান!
মা, আমি পুতুল বিয়েতে গাড়ি খেলবো, গাড়ি কিনে দাও না
আস্তে! দিদা শুনতে পেলে বকুনি দিবে যে।
কেন, আমার বুঝি শখ হয় না!
না মামনি, মেয়েদের শখ থাকতে নেই, তুই যে মেয়ে!

বাবা, বাবা, আমি উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফল করেছি, আমি ডাক্তার হবো।
হ্যাঁ, আমরা খুশি হয়েছি, কিন্তু মেয়েদের এত পড়ে কি হবে!
দাদু, তুমি বাবাকে বোঝাও না ভাইয়ার মতো আমারও পড়তে ইচ্ছে হয়।
দাদুভাই, তুমি তো মেয়ে! মেয়েদের এতো বেশি পড়তে নেই।

সকল ইচ্ছা-শখ পেরিয়ে আজ আমি অন্যের ঘরে
কোলে ফুটফুটে এক কন্যাসন্তান, আগামী প্রজন্ম।

এটা করো না, ওটা করো না, সেটা করো না
নারীর তরে এই না-না-না আর নয়!
সকল উপেক্ষার যুক্তি 'তবুও তুমি নারী'–আমরা আর শুনতে চাই না।
আসুন না আমরা একটু ভাবি, একটু বলি–
"তুমি শুধু নারী নও, তুমিও মানুষ!"

# বোধিবৃক্ষ

## মনজুর শামস

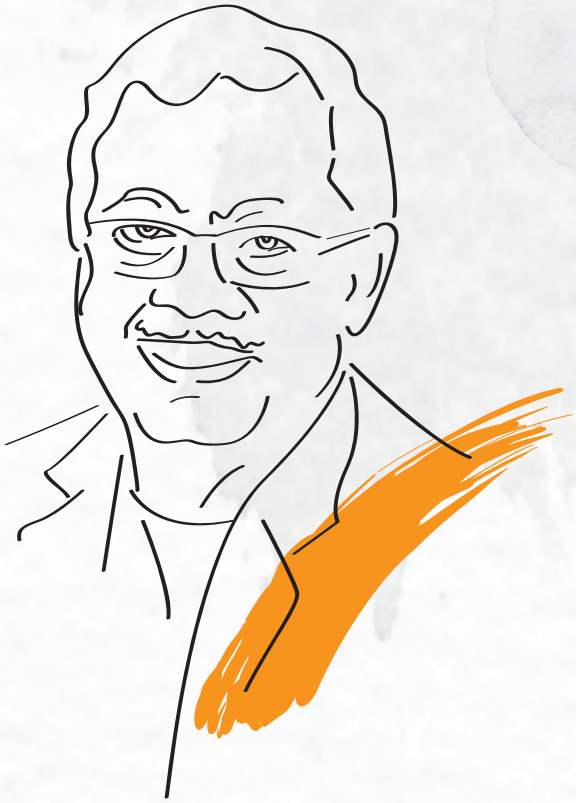

হৃদয়জুড়ে কষ্টের অতল ধ্বনি তুলে
তিনি চলে গেলে তার জ্বেলে যাওয়া
অলোক আলোক শিখা আমাদের মনজুড়ে
সদিচ্ছার সুদৃঢ় অসীম স্পৃহা জাগিয়ে দিয়েছে

নিহত স্বামীর ইচ্ছে পূরণ করে বিধবা উদ্যোক্তা
তার কাঁচির কারখানার বাজার ছড়িয়ে দিয়েছেন
সারাদেশের আনাচেকানাচে; সূর্যমুখী হেসে উঠেছে
আমেনা বেগমের চাষের জমিতে; দুধের নহর বইয়ে
দিয়েছেন চাটমোহরের খামারি নারীবহ্নিশিখা সালমা খাতুন
লালপুর বাজারের মিরা রানি শুঁটকিতে আয় করছেন লাখ লাখ টাকা

সিদীপের শাখাগুলো সংখ্যায় বেড়ে বেড়ে সারাদেশে
ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছে তার উন্নয়ন ভাবনা
দেশের অদম্য অগ্রযাত্রায় শামিল হতে শুরু করেছে
গ্রামীণ প্রান্তজন; অনুসন্ধানী তরুণ প্রজন্ম
জ্ঞানের উন্মেষ বিস্তারে ইচ্ছেমতো বই পড়ার
অবাধ সুযোগ পেয়ে গেছে 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে'

তাঁর শুরু করে যাওয়া প্রকৃতি পাঠে গিয়ে
একজন শিসক শিক্ষিকা চারদিকে শাখা ছড়ানো
ছায়াময় একটি বৃক্ষ দেখিয়ে তার কৌতূহলী শিশুদের
জিজ্ঞেস করেছিলেন–'ওই যে ওই ঝাঁকড়া গাছটা দেখছো–
একটি শাখায় থোকায় থোকায় ফুটে আছে ক্ষুদ্রঋণের ফুল
একটি শাখায় আভা ছড়াচ্ছে আর্থিক আয়োজনের পত্রপল্লব
একটি শাখা মানবসম্পদের পসরা সাজিয়েছে থরে থরে
আর দেখো–ওই শাখাটিতে তথ্যপ্রযুক্তির ফল ধরেছে
ওই শাখাতে হিসেবের চুলচেরা বিশ্লেষণে অলি উড়ছে
একেবারে শীর্ষশাখায় কচি কচি সবুজ পাতায় ক্লাসের পড়া
তৈরি করছে তুলতুলে শিশু আর বৃক্ষটির ছায়ায় বসে উন্নয়ন ভাবনায়
অগ্রযাত্রার কর্মযজ্ঞ সাজানোর মহতী উদ্যোগে ধ্যানে নিমগ্ন একদল উদ্যমি তরুণ
এবার বলো তো ঝাঁকড়া পাতায় স্বপ্ন দোলানো এই দিশাদায়ী বৃক্ষটির নাম কী?
সবাইকে চমকে দিয়ে সাথে সাথে একজন শিসক শিশু হাত তুলে দৃঢ়, স্পষ্ট, অবিচল
কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলো– 'এই বৃক্ষটির নাম উন্নয়ন বীর মোহাম্মদ ইয়াহিয়া'

# জামানা

## নাজিউর রহমান রাকিব

ব্যাঙ ছাড়ে বাঘের ডাক
বাঘ ডাকে মেঁউ।
পুকুরেতে নোনাজল
খালেবিলে ঢেউ!

মোরগ করে খোঁয়ার শাসন
রাজহাঁসে প্রজা!
ইঁদুর দেয় বিড়ালকে
কানে ধরার সাজা!

সাপের শিকার বাজপাখি
হরিণের বাঘ।
অফিসের বসের সাথে
বুয়া করে রাগ!

রাস্তায় নৌকা আর
বাস চলে নদীতে।
টিকটকের মার খাওয়া
পোলা এখন ছবিতে।

রিকশাচালক জাহাজ চালায়
নাবিক করে ঘর সাফ।
চোর গিয়ে চড় মেরে
বিচারককে দেয় মাফ।

দুয়ে দুয়ে পাঁচ বলেই
মন্ত্রণালয়ের এসিস্ট্যান্ট!
অফিসারে লুঙ্গি পরে
কাজের চাকর শার্টপ্যান্ট!

ঘুমের মধ্যে ভাত খাই
স্বপ্নে করি চাকরি।
দালানকোঠা ভেঙ্গে ভেঙ্গে
ইটরড লাকড়ি!

হাঙ্গরকে পোষ মানিয়ে
সুখ পায় শাবানা
কি আর বলবো বাজান
পাল্টে গেছে জামানা!

# শিক্ষা-ভাবনা

## ডা. তোফাজ্জল হোসেন তারা

শিক্ষা শান্তি শিক্ষা শক্তি
শিক্ষা প্রগতি
শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতির
হয়নি উন্নতি।
প্রাইভেট পড়া শিক্ষা দেওয়া
সুবিধা নেওয়া বৈকি
প্রাইভেট পড়া নাম্বার পাওয়া
শিক্ষা কিছু হয় কি?

স্কুলভিত্তিক বইয়ের বোঝা
নিচ্ছে বালক ঘাড়ে
নীতিহীন শিক্ষা উপকরণ
যে যত চাপাতে পারে।
এই উপকরণ চাকরি জীবনে
কতটুকু কার্যকর
পরীক্ষাভিত্তিক পড়া তোমরা
পড়ছো দিনভর ।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড
এই কথা কি মানো
নকলবাজি পাশ করে সব
বেকার হচ্ছে জানো?
শিক্ষা সরবরাহ শিক্ষা চাহিদা
শিক্ষা সকল আশা
বিনিয়োগমুখী শিক্ষাচক্র
রাষ্ট্রযন্ত্র বৃথা।

অভিজিৎ-দুফলো শিক্ষাভাবনা
উন্মুক্ত চিন্তাচেতনা
প্রত্যাশা-প্রাপ্তি যতটুকু তার
প্রযুক্তি শিক্ষা-সাধনা।

# সজনে ডাটা ও তালের পুষ্টিগুণ

পুষ্টিবিদ ফাহমিদা করিম

**সজনের পুষ্টিগুণ**

সজনে ডাটা অতি পরিচিত মজাদার একটি সব্জি যা আমরা মূলত তরকারি হিসাবে খেয়ে থাকি। লম্বা সবুজ রংয়ের এই সব্জিটিকে ইংরেজিতে বলে Drumstick, বৈজ্ঞানিক নাম Moringa oleifera। বিজ্ঞানীরা এই সব্জিটিকে পুষ্টির ডিনামাইট হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ এতে যেমন রয়েছে পুষ্টিগুণ, তেমনি রয়েছে ঔষধি গুণ।

সজনে গাছের উৎপত্তিস্থল ভারত উপমহাদেশ হলেও এই গাছ গ্রীষ্মপ্রধান সব দেশেই জন্মায়। সারা বছর এর ফলন পাওয়া যায়। এই সব্জি আবাদ করে আর্থিক দিক দিয়ে যেমন লাভবান হওয়া যায়, তেমনি স্বাস্থ্য সুরক্ষার কাজে এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সজনে গাছের পাতা, ফুল, ফল, শিকড় সবকিছুই অতি পুষ্টিসম্পন্ন, তাই এই গাছকে বলা হয় 'মিরাকল ট্রি'। গবেষকরা বলেন নিউট্রিশাস সুপার ফুড, কারণ এর ডাটা, বীজ, পাতা, ফুল, ছাল সবকিছুতেই পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টি উপাদান রয়েছে।

বাংলাদেশের পুষ্টি বিজ্ঞান ইনিস্টিটিউটের গবেষণায় দেখা গেছে প্রতি ১০০ গ্রাম ওজনের ডাটায় রয়েছে ৪৩ কি. ক্যালোরি খাদ্য শক্তি, ২.৯ গ্রাম আমিষ, ৫.১ গ্রাম শর্করা, ৮৫.২ গ্রাম পানি, ৪.৮ গ্রাম খাদ্য আঁশ ও ০.২ গ্রাম ফ্যাট। এছাড়াও এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে খনিজ লবণ ও ভিটামিন। খনিজ লবণের মধ্যে রয়েছে ক্যালসিয়াম (২৪ মি. গ্রাম), লৌহ (০.২ মি. গ্রাম), পটাসিয়াম (২৫৯ মি. গ্রাম), ফসফরাস (১১০মি. গ্রাম), ম্যাগনেসিয়াম (২৮ মি. গ্রাম), সোডিয়াম (৪২ মি. গ্রাম), জিংক (০.১৬ মি. গ্রাম), কপার (০.০১ গ্রাম)। ভিটামিনের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন সি, ভিটামিন এ ও বি কমপ্লেক্স রয়েছে। ভিটামিন-এ ২৬ মি. গ্রাম, ভিটামিন-সি ৬৯.৯ মি. গ্রাম, ভিটামিন-বি১ বা থায়ামিন ০.০৪ মি. গ্রাম, ভিটামিন-বি২ বা রিবোফ্লাভিন ০.০৪ মি. গ্রাম, নায়াসিন ০.০৬ মি. গ্রাম, ভিটামিন-বি৬ ০.১২ মি. গ্রাম, ফলেট ৪৪ মাইক্রো গ্রাম। এছাড়াও রয়েছে ম্যাংগানিজসহ অনেক উপাদান। এই পুষ্টি উপাদানগুলি আমাদের দৈনিক চাহিদার অনেকখানি পূরণে সক্ষম, বিশেষ করে ভিটামিন সি সজনে ডাটার কচি অংশে বেশি রয়েছে যা রোগ প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ভিটামিন এ ত্বক ও চোখের সুস্থতায় জরুরি। সেই সাথে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স খাদ্যদ্রব্য হজমে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

সজনে পাতায় রয়েছে ৮ রকমের অত্যাবশ্যকীয় এমিনো এসিড যা অন্য কোন সব্জিতে সহজে পাওয়া যায় না, তাই এর প্রোটিন বা আমিষ অনেক উন্নত মানের। নিরামিষভোজীরা সজনের পাতা থেকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হতে পারেন। পরিমাণের ভিত্তিতে তুলনা করলে সজনে পাতায় কমলালেবুর ৯ গুণ ভিটামিন সি, দুধের ৪ গুণ ক্যালসিয়াম ও ২ গুণ আমিষ, গাজরের ৪ গুণ ভিটামিন এ এবং কমলার ৩ গুণ পটাসিয়াম রয়েছে।

সতেজ শুকনা সজনে পাতার অনেক গুণ রয়েছে। ১ টেবিল চামচ সজনে পাতার গুড়া থেকে ১-২ বছর বয়সী শিশুদের চাহিদার অনেকখানি আমিষ, ক্যালসিয়াম, লৌহ ও ভিটামিন-এ পাওয়া যায়। তাই এর পাতা ও শিকড় প্রসূতি মায়েদের জন্য খুবই উপকারী। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই গাছকে মায়েদের উত্তম বন্ধু এবং পুষ্টির এক অনন্য সহজলভ্য উৎস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

সজনে গাছের ঔষধি গুণও রয়েছে অনেক। আয়ুর্বেদিক শাস্ত্র মতে ৩০০ রকমের রোগ থেকে রক্ষা করে এই সজনে গাছ। সজনের বীজও অত্যন্ত উপকারী, এই বীজ থেকে ভোজ্য তেল হয়। এই তেল হার্টের জন্য উপকারী। তেল বের করার পর এর খইল সার হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং পানি শোধনের কাজেও এটি ব্যবহার করা যায়, কারণ এতে রয়েছে এন্টিব্যাক্টেরিয়াল প্রোপার্টি।

সজনের বাকল, শিকড়, ফুল, ফল, পাতা, বীজ এমনকি এর আঠাতেও ঔষধি গুণ রয়েছে অনেক। বহুগুণে গুণান্বিত সজনে গাছ তাই প্রতিটি বসতবাড়িতেই আদর্শ গাছ হিসেবে থাকা প্রয়োজন এবং দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় এর উপস্থিতি একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

**সজনের উপকারিতা**

- সজনেতে প্রচুর এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় রোগ প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা রাখে।
- রক্তের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে।

- ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
- রক্তের শর্করা বা ডায়াবেটিকস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
- মুখের রুচি বাড়ায়।
- ঠাণ্ডাজ্বর ও সর্দিকাশি দূর করে।
- মাড়ি ফোলা ও রক্ত পড়া রোধ করে।
- পেটের সমস্যা বা বদহজম উপশম করে।
- কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।
- লিভার ও কিডনিকে সুরক্ষিত রাখে।
- হাড় শক্ত ও মজবুত করে।
- বসন্তরোগ প্রতিরোধে উপকারী।
- দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
- শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা দূর করে।
- শরীরের ওজন কমাতে সাহায্য করে।
- হার্টের চিকিৎসা ও রক্ত চলাচল বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
- মাথাব্যথা, মাইগ্রেন, আরথ্রাইটিস, এবং চুল পড়া রোগের চিকিৎসায় উপকারী।
- ক্ষতস্থান সারাতে সজনে পাতার পেস্ট উপকারী।
- ত্বকের সুস্থতা রক্ষা করে এবং এন্টিএজিংয়ের কাজ করে।
- খাদ্য সংরক্ষণের কাজেও ব্যবহৃত হয়।

**সজনে দিয়ে তৈরি কিছু খাবার**

সজনে বাটা অনেকভাবে রান্না করে খাওয়া যায়:

- সরিষা বাটা ও আলু দিয়ে সজনের ঝোল।
- সজনে লাউয়ের নিরামিষ
- সজনে নারিকেল চিংড়ির মালাই
- সজনে দিয়ে মসুর ডালের তরকারি
- সজনে পাতার পাকোড়া
- সজনে দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল
- আম সজনের ঝোল
- সজনে, কুমড়াবড়ি, সরিষার ফোড়ন নিয়ে ঘন্ট
- সজনে পাতার সবুজ রুটি
- সজনে ফুলের ভাজি
- সজনে পাতা এবং আলুর চচ্চড়ি
- সজনে পাতা/শাক হিসেবে ভাজি।
- সজনে পাতা বা ফুলের বড়া।
- সজনে পাতা/শুকনা পাতার গুড়ার চা।

**তালের পুষ্টিগুণ**

প্রতি ৪০০ গ্রাম পাকা তালে রয়েছে ৭৮ কিলোক্যালোরি, জলীয় অংশ ৭৯.৭ গ্রাম, আমিষ ০.৫ গ্রাম, চর্বি ০.৪ গ্রাম, শর্করা ১৭ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৬ মিলিগ্রাম, আয়রন ১.৭ মিলিগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ১৪ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ৫৪ মিলিগ্রাম, পটাশিয়াম ২৩৯ মিলিগ্রাম, ভিটমিন এ ২০৪ মাইক্রোগ্রাম, থায়ামিন ০.৪ মিলিগ্রাম, রিবোফ্লাভিন .০২ মিলিগ্রাম, নায়াসিন ০.৩ মিলিগ্রাম এবং ভিটামিন সি রয়েছে ০৫ মিলিগ্রাম।

- এসব উপাদান শরীরকে নানা ধরনের রোগ থেকে রক্ষা করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- তালে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স থাকায় ভিটামিন বি-এর অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।
- এছাড়াও এন্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ হওয়ায় ক্যান্সার প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে।
- তালে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস থাকায় হাড় ও দাঁতের গঠন ও সুস্থতায় সাহায্য করে।
- ভিটামিন এ থাকায় চোখ ও ত্বকের সুস্থতায় তাল যথেষ্ট উপকারী।
- স্মৃতিশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে এটি সাহায্য করে।
- লিভারকেও সুস্থ রাখতে এর ভূমিকা রয়েছে।
- কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে এটি সাহায্য করে।

পাকা তালের মতো কাঁচা তাল অর্থাৎ তালের শাঁসও একটি উপকারী ফল। খেতে অনেকটা নারিকেলের মতো। গরমের সময় আমাদের দেশে এটি একটি জনপ্রিয় ফল। তালের শাঁস খেতে যেমন সুস্বাদু তেমনি এর পুষ্টিগুণও রয়েছে অনেক।

- তালের শাঁসে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন সি ও ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স রয়েছে। যা আমাদের শরীরের জন্য বিশেষভাবে উপকারী।
- তালের শাঁসে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন এ আছে, যা দৃষ্টিশক্তি প্রখর রাখে। এছাড়াও তালের শাঁস খাবারের রুচি বাড়াতেও অনেকখানি সাহায্য করে।
- তালের শাঁসে থাকা জলীয় অংশ পানিশূন্যতা দূর করতে সাহায্য করে। এছাড়া রক্তশূন্যতা দূরীকরণেও তালের শাঁসের ভূমিকা রয়েছে।

পাকা তাল দিয়ে নানা ধরনের মুখরোচক খাবার তৈরি করা যায়, যেমন: তালের পিঠা, তালের বড়া, তালের কেক, তালের পায়েশ, তালের জুস, তালসত্ত্ব ইত্যাদি। কাঁচা ও পাকা তাল উভয়েরই স্বাস্থ্যগত গুণাগুণ রয়েছে অনেক। উভয়ই পুষ্টিগুণে ভরপুর। তাই আমাদের মাঝেমধ্যেই তাল খাওয়ার অভ্যাস রাখা প্রয়োজন বিশেষ করে গরমের মৌসুমে। খাদ্য তালিকায় এটি হতে পারে পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ ভাল একটি সুস্বাদু ফল।

# রোজিনা খাতুনের সফলতার গল্প

## মো. জাহিদ হাসান

কঠিন বাস্তবতার মুখে পড়ে একসময় চারিদিক অন্ধকার দেখছিলেন রোজিনা খাতুন। নাটোর জেলার খুবজিপুর ইউনিয়নের গুরুদাসপুর থানার বামনবাড়িয়া গ্রামের অধিবাসী সে। স্বামী মো. মতিউর রহমানের একার আয়ে সংসার চালাতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। নিজ জমিতে চাষ করেও তার মাসিক আয় ছিল ১০-১২ হাজার টাকা।

রোজিনা খাতুনের সংসারের তিন মেয়ে ও এক ছেলে। তার বড় মেয়ে মিতুয়ারা অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। মেঝ মেয়ে ৯ম শ্রেণির ছাত্রী, ছোট মেয়ে শিখা খাতুন ৮ম শ্রেণির ছাত্রী এবং একমাত্র পুত্র রিয়াম ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। সংসারের আয় বাড়ানোর কথা ভাবতে ভাবতে একসময় তিনি ঠিক করলেন সিদীপের গুরুদাসপুর ব্রাঞ্চের বামনবাড়িয়া মহিলা সমিতিতে ভর্তি হবেন।

সমিতির সদস্য হওয়ার পর কয়েক মাস তিনি কেবল মাসিক সঞ্চয় করতে থাকেন। এরপর ২০২১ সালে ২৭ জানুয়ারি মাসে ২০,০০০ টাকা এসএমএপি কৃষি ঋণ নেন। দ্বিতীয় দফায় ২০২১ সালের ২৯শে নভেম্বরে মাসে ২০,০০০ টাকা এসএমএপি কৃষি ঋণ নিয়ে রসুন চাষ করেন। এবার তিনি ৩৩ শতাংশ জমিতে রসুন চাষ করেছেন। রসুনের উৎপাদন হবে প্রায় ৩৫ মণ। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রতি কেজি ৫০ টাকা হিসাবে ৩৫ × ৪০ × ৫০ = ৭০,০০০ টাকা।

এছাড়াও রোজিনা খাতুন এবার ২৩১ শতাংশ জমিতে ভুট্টা চাষ করেছেন। প্রতি বিঘায় ভুট্টা উৎপাদন হয় প্রায় ৫০ মণ। তার মোট ভুট্টা উৎপাদন হয় ৪২০ মণ। যার বাজার মূল্য প্রতি কেজি ২৭.৫০ টাকা হিসাবে ৪২০ × ৪০ × ২৭.৫০ = ৪,৬২,০০০ টাকা। তাকে আমরা বাজারজাতকরণের জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকি। ভুট্টা চাষে তার মোট খরচ হয় প্রায় ৮৪,০০০ টাকা এবং সমস্ত খরচ বাদে আয় হয় ৩,৭৮,০০০ টাকা। এছাড়াও রোজিনা খাতুন ধান ও পাট চাষ করেন। এছাড়া তার গরুর সংখ্যা ২টি। আর এই ২টি গরু বিক্রয় করেছেন ২,৮০,০০০ টাকায়। এ থেকে সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে আয় থাকবে

৬০,০০০ টাকা। রোজিনা খাতুন তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করলে সফলতা একদিন আসবেই। রোজিনাই তার বাস্তব উদাহরণ।

*লেখক: সিদীপের উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা, পাবনা জোন*

*পাললিক সৌরভ প্রকাশনী, একুশে বইমেলা ২০২২, ঢাকা (পৃ. ৬৩, মূল্য ২০০ টাকা)*

গল্পনাট্য

# চান্দের হাটের কথকতা

## নাজনীন সাথী

সোনাপুর গ্রামের চান্দের হাট। মাত্র কয়েক দশক আগেও বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে হাট ছিল কেনাবেচার একমাত্র সরগরম স্থান। কথাটা এখানে এজন্য আসছে কারণ বাজার-দোকানপাট লোকসমাগম ও বেচাকেনার দিক থেকে অতটা সরগরম ছিল না। সপ্তাহান্তে হাটবারের দুইদিন নানা পণ্য নিয়ে লোকজন হাটে আসতো দূরদূরান্ত থেকে। কৃষকেরা উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করতো। তাই তখনকার বাজার ব্যবস্থায় হাটই ছিল উচ্চকিত স্থান।

এখন চারিদিকে বিশ্বায়নের জয়জয়কার। আমাদের হাতের নাগালে সবর্ত্র বাজার অর্থনীতির মোচ্ছব। বোতামে আঙুল ছোঁয়ালেই পণ্য এসে হাজির হাতের নাগালের মধ্যে। কর্পোরেট দুনিয়াতে নাট্যকার পীযূষ সিকদার চান্দের হাটের কথা বলছেন। ইউরো ডলার পেরিয়ে রিয়েল টাকার সঙ্গে মোবাইল ফোনকে সঙ্গে নিয়ে আমাদেরকে শোনাতে চাচ্ছেন সোনাপুর গ্রামের হাটের কথকতা।

এদেশের  অসংখ্য নদনদী হাওর-বাওর বেষ্টিত জনপদের প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে আছে নানা কল্পকাহিনী। পলিঘেরা বদ্বীপের অধিবাসীদের মন, বংশ পরম্পরায় নানাধরনের সুর ও সঙ্গীতের ছোঁয়ায় স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে। নাট্যকারের দৃষ্টি আমাদের দেখাতে নিয়ে যায় চারটি গ্রাম ও একটি নদের পাড়ের সোনাপুর গ্রামের চান্দের হাটকে। সেখানে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জমিদার শচীন্দ্র বাবু। নিজের জমিদারিতে তিনি এই হাট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

দূরদূরান্ত থেকে বণিকদের নিয়ে এসে চান্দের হাট আস্তে আস্তে জমিয়ে তুলেছিলেন। সেসব শত বছর আগে গত হওয়া ইতিহাস। কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে রাজা জমিদাররা। তাদের দোর্দণ্ড প্রতাপের ভূমিতে ক্ষয়ে যাওয়া ইটের ফাঁকফোকর গলে রাজত্ব করে আজকের কোরবান ফকিররা। কোরবানের জন্ম হয়েছিলো ফকির বংশে কিন্তু সে ফকরামি ছেড়ে দিয়ে পাড়ি জমায় মরুর দেশে। ধূসর মরুভূমি তাকে টাকার সন্ধান দেয়। সে এখন অনেক অনেক টাকার মালিক। গ্রামে ফিরে এসে কুরবান তার স্ত্রী-পরিবারের জন্য ঝাঁকা ভরে বাজার করে আনে চান্দের হাট থেকে। সোনাপুর গ্রামের কোরবান ফকির। কুয়েত ফেরত কুরবান ফকির। অনেক টাকার মালিক হয়েও স্বভাব পাল্টাতে পারে না। তাই ঝাঁকাভরা বাজার চান্দের হাট থেকে ভ্যানে করে না এনে মাথায় করে নিয়ে আসে সোজা তার দোতলা বাড়িতে। পেশাগতভাবে ফকিরগিরি ছেড়ে দিলেও কোরবানের মগজের গহীনে খেলা করে গভীর ভাব। বৈশাবী নদের তীরে দাঁড়িয়ে আলো আঁধারির মাঝে শত শত মানুষের সঙ্গে কোরবান ফকির দেখতে পায়–হঠাৎ নৌকায় কে যেন আসে! অন্ধকারে বোঝা যায়। নৌকা নদীর ঘাটে থামে। দিঘল দেহ। পাট করা চুল। আলো আঁধারির ইন্দ্রজাল কেটে গিয়ে কোরবান মুখোমুখি হয় জ্বলন্ত বাস্তবের–একপাশে পড়ে থাকে স্ত্রী কুলসুম, চান্দের হাট, সোনাপুর গ্রাম, বৈশাবী নদ; অন্যদিকে পূবপার্শ্বে খানিকটা দূরে ধান গম আটা মাছ সবজি নয়, অন্যকিছু বেচাকেনা হয়। এখানে বেচাকেনা হয় শরীর, কেউবা দুধ বেচে কেউবা দুধ বেচে গাঁজা খায়!

চর্যাপদ থেকে শ্রীকৃষ্ণের কীর্তন, আলাউল থেকে মনসামঙ্গল সবকিছুকে অতিক্রম করে এদেশে আসে ইংরেজ বণিকেরা। বাণিজ্যের সাথে তারা নিয়ে আসে নিজ দেশের সাংস্কৃতিক নীতি। দুইশো বছরের শাসনকালে এই জনপদের উপরে তাদের সংস্কৃতির মোটা প্রলেপ দেয় তারা। তবে আবার কেন সেই কথনরীতি যা আমাদের বাংলার সংস্কৃতির শিকড়ের কথা মনে করিয়ে দেবে? ঔপনিবেশিক বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে এদেশের নাটকের দিকপালেরা–তাদের মধ্যে সেলিম আল দীন অন্যতম। নাট্যকার পীযূষ সিকদার তার গুরুর দেখানো পথে হেঁটে কি শেকড়ের সন্ধান করতে চেয়েছেন? তাঁর আগামী পথচলায় আমরা তারই সন্ধান করবো। নাট্যকারের জন্য শুভকামনা।

*লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি*

কাব্যগ্রন্থ

# নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে দূরত্বে

## মাহফুজ সালাম

‘নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে দূরত্বে’ কবি শিশির মল্লিকের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। প্রতিকথা প্রকাশনী থেকে ২০২২এর ফেব্রুয়ারি এটি প্রকাশিত হয়। এখানে ৫১টি কবিতা স্থান পেয়েছে। কবি বহুদিন কবিতাগুলো পুষে রেখেছেন আপন খাঁচায়। এবার পত্রপল্লবে বিকশিত হয়ে তা পৌঁছে গেলো পাঠকের কাছে। শিল্পের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করেও তিনি নিজেকে একজন সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করেন। মূলত তিনি একজন চিত্রশিল্পী, কবি ও লেখক।

‘নিদিষ্ট বিন্দু থেকে দূরত্বে’ কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতায় জড়িয়ে আছে প্রেম, প্রকৃতি, মিথ ও জীবনঘনিষ্ঠ সমাজের চালচিত্র। নিজের অনুভূতির সাথে সমাজের অসঙ্গতিগুলো চিহ্নিত করে তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মাটি ও মানুষের সেতুবন্ধ সৃষ্টি করতে চান তিনি। কবির এ চাওয়া কখনো প্রেম, কখনো  দ্রোহ, কখনো ভাঙার গান, কখনো স্বপ্নবিলাসে ভর করেছে। এই পরম পাওয়ায় কখনো তিনি স্রোতের অনুকূলে আবার কখনো বড় একাকী পথ হাঁটেন। যেমন বন্ধ ঘরে একা কবিতাটিতে তিনি বলছেন–দরজাটা বন্ধ/থাকে সে একা একা/একা একা শিস দেয়/একা একা গান গায়/।

‘নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে দূরত্বে’ শীর্ষক দীর্ঘ কবিতাটিতে কবি নিজেকে তুলে ধরেছেন এভাবে, ‘একটি বিন্দু থেকে শুরু করি/একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে গিয়ে থিতু হই/আবার সেখানে ফিরি; থিতু হই/ আবার ঐ বিন্দুতে গিয়ে থামি-/আবার ফিরি-।

এই যে সীমা থেকে অসীম আবার অসীম থেকে সসীমের মধ্যে বিচরণ এবং বৃত্তের বেড়া ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা; একটি সুষম সমাজ বিনির্মাণ করা, এটিই মূলত এ কাব্যগ্রন্থের মূল সুর ও কবির স্বপ্ন বলে আমার মনে হয়েছে।

কাব্যের প্রথম কবিতা ‘ডানার ঝাপট’। এখানে প্রেমেও কবির টানাপোড়েন: ‘তুমি আছ বলেই কি আমি সুন্দর/নাকি আমার জন্যে তোমার উপস্থিতি/সৌন্দর্যের মুগ্ধতা; স্তুতি গান অর্ঘ্য অমরতা/পরম্পরার নশ্বর এই দান-মান/হ্রস্ব-দীর্ঘর টানাপোড়েন’।

‘শাশ্বত’ কবিতায় কবি সমাজ বৈষম্যের চিত্র আঁকেন এভাবে: ‘এত বিভেদ বৈষম্য ব্যভিচার এই কি চরম সত্য/আমি তো স্পষ্ট করে জানি না নিজস্ব অতীত/আগামীটা কি শুধুই একরৈখিক জ্যামিতিক সীমা।

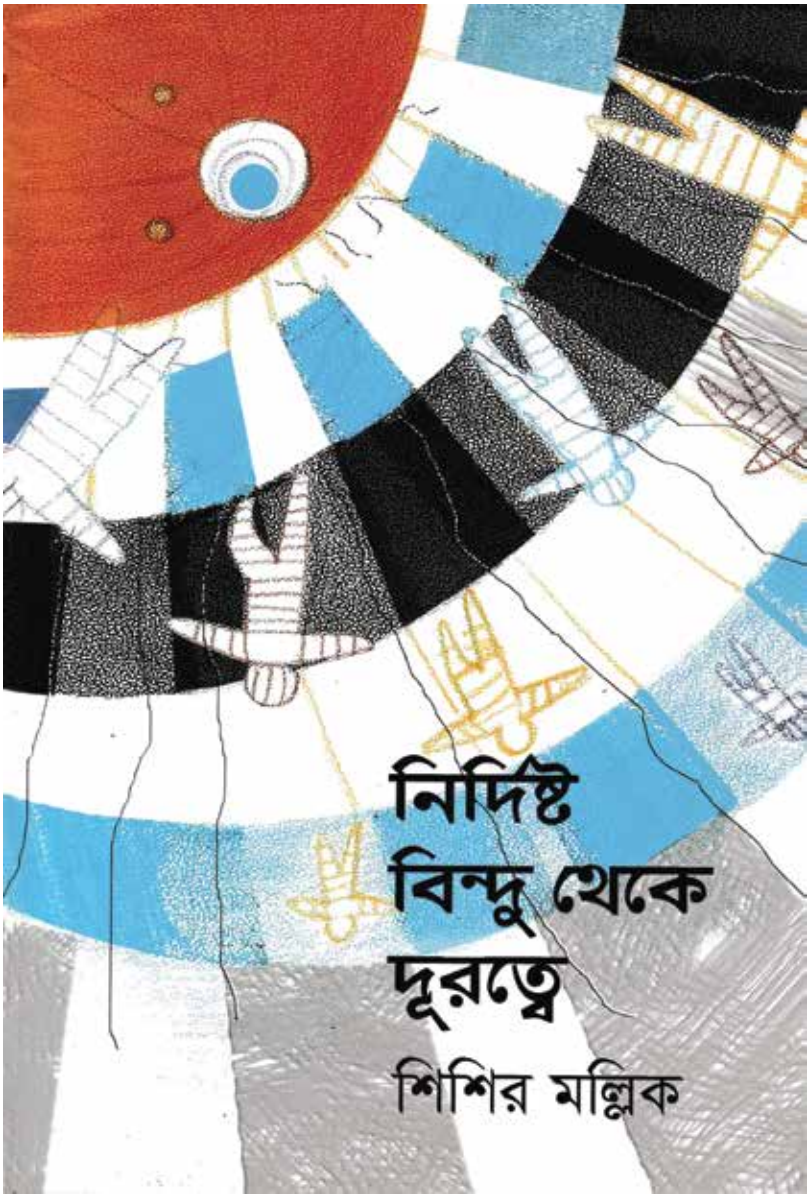

এই সত্যের ভিতর দিয়েই কবি শিল্পের অশরীরী অপ্সরার ধ্যান করেন–তবে কি বিমূর্ততায় সত্য সুন্দর/শিল্পের অশরীরী অপ্সরা/মোহাবিষ্ট আমি যেন ক্রমশ ছুটি/সেই অরূপ আঁধারে।

'ব্রহ্মপুত্রের জল' কবিতাটি প্রকৃতি প্রেমের এক নির্মল উদাহরণ–'ব্রহ্মপুত্রের রূপ কি হয়েছিল দেখা/নীলাকাশ, ধূসর দিগন্ত, বকপাখির ওড়াওড়ি/মাঝি-মাল্লার গান/কী অপরূপ শুভ্র শরৎ/সবই তো ছিল/কিন্তু চৈত্রের খরতাপে আজ তার বিবর্ণ রূপ কবির হৃদয়কে ব্যথিত করে।' শেষে এসে বলছেন–হঠাৎ তোমার চিৎকারে সম্বিত পেয়ে দেখি/মনুষ্য পাতা জালে আটকে গেছো তুমি-/মৎস্যকন্যা।

'স্রোতস্বিনী' কবিতায় সমাজের অসঙ্গতি কবিকে ব্যথিত করে: 'স্বপ্নসাধ আলোর ঝলকানি মুছে যায়/দীর্ঘ হয় দীর্ঘশ্বাস/ভাঙে স্বপ্নের গাঙ দাপুটে স্রোতে/মাছের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে পাতানো জালে/আটকে যায় রূপোলি জীবন ।

একজন কবি প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য, মৌনতায় ধ্যানমগ্ন চিত্তে মানুষের অন্তর্নিহিত কথাগুলো ভাবের পাখায় ভর করে প্রকাশ করেন। তাইতো কবি যেমন নিজের কথা বলেন। তেমনি নিজের হয়েও সবার। সমাজ বিনির্মাণে বিজয় ছিনিয়ে আনতে চলমান এই অসঙ্গতির ভাবনা ও জীবনযুদ্ধের কোন বিকল্প নেই। তাইতো কবির নিজের প্রতি নিজের ক্ষোভ, জিজ্ঞাসা, সীমাদ্ধতা কবিকে তাড়িয়ে বেড়ায়। কথপোকথন কবিতায় কবি বলেন, কিছু জয় করতে হলে–তার জন্যে লড়ার বিকল্প কী হতে পারে/তবে কথাটা হচ্ছে শাসনের, কে কার বিরুদ্ধে জিতবে/অথবা কে কাকে শাসাবে–তারই প্রশ্ন।

এই বিপুলা পৃথিবীতে এক সময় প্রেমের প্রধান অনুষঙ্গ ছিল প্রেমপত্র। ডিজিটালাইজেশনের যুগে এসে মুঠোফোন দখল করে নিয়েছে তার স্থান। এখন চিঠি লেখার প্রয়োজন নেই। সচিত্র প্রেম এসে ধরা দিয়েছে হাতের মুঠোয়: মুঠোফোনের শাব্দিক সংকেত/বাতাসে কম্পন

একজন কবি প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য, মৌনতায় ধ্যানমগ্ন চিত্তে মানুষের অন্তর্নিহিত কথাগুলো ভাবের পাখায় ভর করে প্রকাশ করেন। তাইতো কবি যেমন নিজের কথা বলেন। তেমনি নিজের হয়েও সবার। সমাজ বিনির্মাণে বিজয় ছিনিয়ে আনতে চলমান এই অসঙ্গতির ভাবনা ও জীবনযুদ্ধের কোন বিকল্প নেই। তাইতো কবির নিজের প্রতি নিজের ক্ষোভ, জিজ্ঞাসা, সীমাদ্ধতা কবিকে তাড়িয়ে বেড়ায়।

তোলে/কতদিন পর/তোমার সমস্ত গচ্ছিত খবর/যা তুমি রেখেছিলে আমারই জন্যে /দীর্ঘ ... দীর্ঘকাল ('মুঠোফোনের শাব্দিক সংকেত')।

'অবান্তর' কবিতায় বলছেন, 'তুমি আমি অস্থির চঞ্চল আমি জ্বালি মরণের চিতা/যার আগুনে পুড়ে পুড়ে হারাও যদি তুমি রূপের আকার/আমার কী হবে এ প্রশ্ন হয়ত অবান্তর।'

'প্রত্যয়' কবিতায় কবি মানুষের জয়গান গেয়েছেন। মানুষের প্রতি কবির রয়েছে অগাধ বিশ্বাস, স্বর্গের প্রাচুর্যের চেয়ে মানুষ ছড়াবে আলো সৌরবিশ্বে এটাই তার প্রত্যাশা: মানবিক চেতনা বেহেস্তের বর্ণন ভেঙে/প্রাচুর্যের ঠিকানা গড়েছে মর্তে/মানুষই ছড়াবে আলো সৌরবিশ্বে/সহস্র নক্ষত্রের ছায়াপুঞ্জে অসীম শূন্যতায়।

একদিকে মানুষের প্রতি কবির বিশ্বাস অন্যদিকে কবি যে স্বপ দেখেন, সে স্বপ্ন পদদলিত হয় মানুষের কাছেই। 'আমারই নগুরিপনায় ধর্ষিতার করুণ চাহনি/তুমি হারিয়েছ তোমার যৈবতী উদ্দাম।' এ যেন আমাদের চারপাশের ইঁদুর-বিড়াল খেলা। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সর্বত্রই যেন এই খেলার ক্ষেত্র। এই সত্যকেই কবি তুলে এনেছেন তার কবিতায়।

যেখানে আপোশকামিতাই প্রধান সেখানে ন্যায়-অন্যায় একাকার হয়ে যায়। আর বীরেরা সেখানে শিরোস্ত্রাণ ফেলে রূপকুমারীর সাজানো বাগানে ভিড় করে। 'শিরোস্ত্রাণহীন বীরেরা' কবিতায় কবি সমাজের সে চিত্রই এঁকেছেন। 'শৈশব জানালার অদূরে তুমি' কবির একটি ব্যতিক্রমধর্মী কবিতা। এখানে কবি যেন নস্টালজিয়ায় ভুগছেন।

সবশেষে যে কথাটি বলতে চাই তা হলো–কবি শিশির মল্লিক তার কবিতায় প্রকৃতি, প্রেম ও জীবনের দ্বন্দ্বসংঘাত, চাওয়াপাওয়া, না পাওয়ার কথাগুলো বলতে গিয়ে শিল্প, বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্য দিয়ে তার কালিক ভাবনাকে শিল্পের ভাষায় ভিজুয়ালাইজ করেছেন। যা পাঠকের চিন্তা ও ভাবনা জগতকে নাড়া দিবে বলে মনে করি। কবির এ গ্রন্থটির বেশকটি কবিতা বিজ্ঞান ও দর্শনের গভীর উপলব্ধিজাত। এ কাব্যের বহুল প্রচার কামনায় শেষ করছি।

*লেখক: কবি ও সমালোচক*

# ভ্যান গঘের ভুবনে অবগাহন

## আশরাফ আহমেদ

গতকাল ওয়াশিংটন ডিসি এলাকার এক অখ্যাত স্থানে খ্যাতিমান চিত্রকর বা পেইন্টার ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ-এর একটি প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলাম। স্থানটি অখ্যাত এই জন্য যে, দুর্গম এই স্থানটি খুঁজে পেতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। রোড আইল্যান্ড এভেনিউতে অবস্থিত ওয়াশিংটন ডিসি-র এই এলাকাটিতে আগে আমার কদাচিৎ আসা হয়েছে বলে মনে পড়ছে না। ঠিকানা অনুসরণ করে করে ভিড় ঠেলে একঘণ্টা পর জিপিএস প্রায় পঞ্চাশটি ডান-বাম ঘুরিয়ে যেখানে নিয়ে এল, সেখানে একটি রাস্তা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো না। ভাবলাম ফোন করে খোঁজ নেই। কিন্তু ইলেক্ট্রনিক টিকেটের গায়ে না ছিল প্রদর্শনী ভবনের বা আয়োজকের দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনো নাম অথবা ফোন নম্বর! চাকুরি জীবনে কষ্টার্জিত আয় থেকে জমানো চৌষট্টিটি ডলার খোয়া গেল ভেবে নিজের নির্বুদ্ধিতাকে অভিশম্পাত করতে করতে যখন ফিরে আসার উপক্রম করছিলাম, স্ত্রী দৌড়ে গিয়ে এক পুলিশের গাড়ি থামিয়ে সাহায্য চাইল। পুলিশ বলল, ওহ, তোমরা ভ্যান গঘ-এ যেতে চাও, এই রাস্তা ধরে উঠে গেলেই পুরো দেয়াল জুড়ে বিশাল পোস্টারটি চোখে পড়বে। ফলে সময়মতোই আমরা প্রদর্শনীতে ঢুকতে পেরেছিলাম। এটি ছিল 'বিগ লট' নামে চেইন স্টোরের একটি পরিত্যক্ত ভবনে।

আগে নামটি জানলেও ভ্যান গঘের সাথে আমার সঠিক পরিচয় ১৯৭৬ সালে। কোনো এক মন খারাপ করা দুপুরে জহুরুল হক নামের এক বন্ধু বলেছিল, এই সামান্য ব্যাপারেই তোর মনটি খারাপ হয়ে গেল? তা হলে দুখী মানুষ কাকে বলে তা জানতে এই বইটি পড়ে দেখ। (বহু বছর হয়ে গেল এই বন্ধুটির আর কোনো খোঁজ পাই না।) ইংরেজি এই বইটি ছিল ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত আরভিং স্টোনের লেখা 'দি লাস্ট ফর লাইফ' নামে ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের জীবনীমূলক উপন্যাস বা বায়োগ্রাফিকেল নোভেল। বুকের নিচে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করে আত্মহত্যা করার পূর্ব পর্যন্ত মানসিক রোগাক্রান্ত এই শিল্পী প্রায় পুরোটা জীবন গভীর নিঃসঙ্গতায় কাটিয়েছিলেন। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ এবং ছবি আঁকাই ছিল তার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন।

১৮৫৩ সালে হল্যান্ডে জন্ম নেয়া ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ মাত্র ৩৭ বছর বেঁচে ছিলেন। এই স্বল্প জীবনেই তিনি ২০০০ শিল্পকর্ম সৃষ্টি করে গেছেন যার মধ্যে ৯০০টি ছিল চিত্রাংকন আর বাকিগুলো ছিল রেখচিত্র-ড্রয়িং। পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রিত পেইন্টিংগুলোর মাঝে ভ্যান গঘের আঁকা ছবিগুলো অন্যতম। অথচ জীবিতাবস্থায় তিনি মাত্র একটি বিক্রয় করতে পেরেছিলেন। তাঁর সৃষ্টির অধিকাংশই ছিল জীবনের শেষ ১০ বছরে করা।

তাঁর লেখা ৮৪৪টি চিঠির মাঝে ৬৬২টিই ছিল তাঁর ছোটভাই থিও-র কাছে লেখা।

তাঁর বিখ্যাত ১০টি চিত্র হচ্ছে স্ট্যারি নাইট, সানফ্লাওয়ার্স, হুইটফিল্ড উইথ ক্রোওস, দি পোটাটো ইটার্স, ক্যাফে টেরেস এট নাইট, স্ট্যারি নাইট ওভার দি রোড, বেডরুম ইন আর্লেস, আলমন্ড ব্লোসম, সেলফ পোর্ট্রেট উইথ বান্ডেজড ইয়ার এবং আইরিসেস। সেই ছাত্রজীবনে পড়া আরভিং স্টোনের লেখা 'দি লাস্ট ফর লাইফ' নামে শিল্পীর একটি জীবনী-উপন্যাসে 'দি পোটাটো ইটার্স' ছবিটির খোঁজ করেও এই প্রদর্শনীর কোথাও দেখতে পেলাম না।

প্রথম ঘরটিতে পা দিতেই তিনটি কালো দেয়াল জুড়ে নিজের আঁকা ভ্যান গঘের অসংখ্য চিত্র বা সেলফ-পোর্ট্রেট দেখতে পেলাম। মনোবৈকল্যে আক্রান্ত এই শিল্পী একসময় নিজেই নিজের একটি কান কেটে নিয়েছিলেন। কানকাটা অবস্থায় শিল্পীর নিজের আঁকা একটি ছবিও সেখানে ছিল। মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে আত্মহত্যা করে মৃত্যুবরণকারী ভ্যান গঘের প্রেতাত্মা এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলেও সন্দেহ হলো। ফলে গা ছমছম করা এক অনুভূতির সৃষ্টি হলো। উল্টোদিকের প্রায় পুরোটি দেয়াল জুড়ে প্রদর্শনীর মূল প্রচারণা চিত্র। আমাদের ভয় ভাঙাতেই হয়তো অভ্যর্থনাকারী বলল আসুন, এখানে দাঁড়ান, আপনাদের একটি ছবি তুলে দেই।

এবার মূল প্রদর্শনীর কথায় চলে আসি। আমেরিকায় 'বিগ লট' হচ্ছে একই ছাদের নিচে আয়তনে বিশালাকৃতির একটি চেইন স্টোর। আগেই বলেছি আমরা আজ যে স্থাপনাটিতে এসেছি তা এই বিগ লটেরই পরিত্যক্ত একটি ভবন। ভবনের সামনের বিশাল দেয়াল জুড়ে ভ্যান গঘের অংকিত ছবি শোভা পাচ্ছে। ভবনটির ভেতরে মেঝে থেকে ছাদ অব্দি কালো দেয়াল লাগিয়ে পাঁচটি অতিকায় ঘর বানানো হয়েছে। এর তিনটিতে শিল্পীর অংকিত বিখ্যাত ছবিগুলোর হুবহু নকল বা রেপ্লিকার পাশাপাশি ছবিগুলো অংকনের সময় ও পটভূমি বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম ঘরটিতে শিল্পীর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বর্ণনা ছাড়াও একটি দেয়াল জুড়ে প্রায় কুড়িটি শিল্পীর নিজ অংকিত মুখাবয়ব শোভা পাচ্ছে। এই ঘরে আরো রয়েছে হলোগ্রামের মতো দেখতে প্রমাণ সাইজের ভ্যান গঘের একটি আবক্ষ মূর্তি যেটি অনবরত পরিবর্তনশীল আলোর প্রভাবে দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আটকে রাখে।

দি বেডরুমের দক্ষিণ ফ্রান্সের আর্লেস শহরের 'হলুদ বাড়ি'র এই ঘরটিতে ভ্যান গঘ মোট তিন বছর কাটিয়েছিলেন এবং তিনটি ছবি এঁকেছিলেন। প্রদর্শনীতে ত্রিমাত্রিক ও প্রমাণ সাইজের এই ঘরটি সৃষ্টি করা হয়েছে শিল্পীরই অংকিত একটি পেইন্টিং অবলম্বন করে। শিল্পী এটি এঁকেছিলেন ১৮৮৫-৮৬ সালে, মুগ্ধ হয়ে দেখা কাঠে খোদাই করা ছাঁচে ছাপানো জাপানের 'উকিওয়ে' নামে এক ধরনের পেইন্টিং দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে। এই ঘরে দাঁড়িয়ে ভ্যান গঘের সান্নিধ্য পাবার দর্শকদের কল্পনাটিকে বাস্তবিক করার এক প্রচেষ্টা নিয়েছেন প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষ।

ভ্যান গঘের বিখ্যাত পেইন্টিংগুলোর মাঝে 'সানফ্লাওয়ার' অন্যতম, কিন্তু তাঁর অংকিত সানফ্লাওয়ার বলতে একটিমাত্র পেইন্টিংকে বোঝায় না। সানফ্লাওয়ার হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন মিউজিয়ামে মোট এগারোটি ক্যানভাসে অংকিত পেইন্টিং যার সবচেয়ে বিখ্যাতটি রয়েছে বিলাতের ন্যাশনাল গ্যালারি অব লন্ডনে।

**ভ্যান গঘের ভুবনে অবগাহন:** আনুমানিক ৫০ ফুট দীর্ঘ ও ২৫ ফুট প্রশস্ত এই গ্যালারির প্রদর্শনীটিতে ঘরের মেঝে এবং চারটি দেয়ালে অনবরত সিনেমার মতো দৃশ্যের পরিবর্তন হয়ে চলেছে। দৃশ্যগুলো বানানো হয়েছে ভ্যান গঘের ২০০ রঙিন পেইন্টিংয়ের সম্মিলন ঘটিয়ে। তাঁর সাথে কাল্পনিকভাবে যোগ করা হয়েছে ভ্যান গঘের অপ্রকৃতিস্থ মনে কী কী ভাবোদয় হয়ে থাকতে পারতো, যা থেকে বিখ্যাত সেইসব চিত্রগুলো তিনি আঁকতে পেরেছিলেন। ভ্যান গঘের বাসস্থান বা কক্ষ থেকে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দেখা দৃশ্যগুলোকে কৃত্রিম আলোর সাহায্যে কাল্পনিকভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এক-দেড়শত বছরের পুরনো পেইন্টিংয়ের সাথে আলো ও শব্দের আধুনিক প্রযুক্তিগত সমন্বয় ঘটিয়ে এখানে এক মায়াজালের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। দর্শকরা তাতে নিজেকে ভ্যান গঘের পৃথিবীতে এক ঘোরলাগা অনুভূতি নিয়ে নিমজ্জিত হয়ে যায়।

যতোক্ষণ খুশি শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে বা হেঁটে আপনি সেই পৃথিবীতে বিচরণ করতে পারেন। অনুভব করার চেষ্টা করতে পারেন এইসব দৃশ্যাবলীর বিশেষ কোন মুহূর্তটি ভ্যান গঘকে 'দি স্ট্যারি নাইট', 'সানফ্লাওয়ার', 'ট্রি রুটস', 'বুকে', বা 'আইসিস'-এর মতো কালজয়ী পেইন্টিং সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।

এরপর আজীবন দুখী এই শিল্পী ধীরে ধীরে কীভাবে পাগলামির দিকে ঝুঁকে পড়লেন এবং মদ্যপানে নিমজ্জিত হয়ে নিজের পৃথিবীকে সংকুচিত করে আনছিলেন তা বোঝাতে বিভিন্ন শব্দ ও আলোর সমন্বয়ে কিছু 'ভিন্ন দৃষ্টি' বা অপটিক্যাল ইলুশন সৃষ্টি করে দর্শককে ভ্যান গঘের তৎকালীন মনোজগতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই সম্মোহনী বা মায়াজাল থেকে বেরিয়ে এলেই প্রদর্শনীটি শেষ হয়ে যায় না। পরের কক্ষটিতে রয়েছে ভার্চুয়াল রিয়ালিটির মাধ্যমে ভ্যান গঘের পৃথিবীতে ভ্রমণ। বছর দুই থেকে ফেসবুক 'অকুলাস' নামে ভার্চুয়াল রিয়ালিটির যে যন্ত্রটি বাজারে চালু করেছে, প্রদর্শনীটি তারই আদিরূপ। এখানে আপনি চোখে ও কানে একটি যন্ত্র লাগিয়ে বসে থাকবেন। স্থির হয়ে বসে থাকলেও সুইচ টিপার সাথে সাথেই আপনার চোখের সামনে একটি ত্রিমাত্রিক দৃশ্য ভেসে আসবে এবং কানে দৃশ্যটির বর্ণনা শুনতে পাবেন। এরপর আপনি অনুভন করবেন যে আপনার আসনটি রেল বা মোটরগাড়ির মতো একস্থান থেকে অন্যস্থানে এগিয়ে যাচ্ছে, ভ্যান গঘের বাসস্থান ছেড়ে বাড়ির আশেপাশে বিভিন্ন গাছপালা, ফুল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার পাশাপাশি বর্ণনা শুনবেন এবং গাড়িটি আবার ভ্যান গঘের বাসায় ফিরে আসবে। চোখ থেকে যন্ত্রটি খুলে ফেললে দেখতে পাবেন আপনি যে টুলটিতে বসেছিলেন, সেখানেই বসে আছেন। অর্থাৎ ভার্চুয়াল রিয়ালিটির মাধ্যমে আপনি প্রায় ১৩৫ বছর আগের ভ্যান গঘের পৃথিবীতে ভ্রমণ করে এসেছেন। এই ভ্রমণটির জন্য অবশ্য আপনাকে অতিরিক্ত জনপ্রতি ১৫ বা ২৫ ডলারের টিকেট কিনতে হবে।

*৭ই জুন ২০২২*

*লেখক: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বিজ্ঞানী ও লেখক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক। মুক্তিযুদ্ধ, বিজ্ঞান বিষয়ক রম্য রচনা, সমাজ ও ভ্রমণ-নির্ভর বেশ ক'টি গল্পের বই ও উপন্যাস লিখেছেন।*

# সিদীপে কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা

১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ সিদীপের সভাকক্ষে সংস্থার কর্মীর সন্তানদের জন্য কৃতী শিক্ষার্থী সম্মাননা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সংস্থার কর্মীকল্যাণ তহবিল থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও সনদ প্রদান করা হয়। সংবর্ধনা ও পুরস্কার লাভ করেন নদোনা ব্রাঞ্চের বিএম জনাব মো. সোলায়মানের মেয়ে সুমাইয়া আক্তার (এসএসসিতে এ+), সোনারগাঁও-২ ব্রাঞ্চের বিএম মোহাম্মদ তারিকুল ইসলামের মেয়ে তাসমিয়া তাবাসসুম (এসএসসিতে এ+), মাওনা ব্রাঞ্চের বিএম জনাব মুহাম্মদ আব্দুল সুলতানের ছেলে শাহরিয়ার হোসেন (এইচএসসিতে এ+), প্রধান কার্যালয়ে অবস্থানরত ম্যানেজার (ক্রেডিট প্রোগ্রাম) জনাব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলামের ছেলে ইলমান কায়েস (এইচএসসিতে এ+) এবং সংস্থার এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার শান্ত কুমার দাসের মেয়ে সুমী রানি দাস (বিএ অনার্স, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

কৃতী শিক্ষার্থী সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব ফজলুল বারি। এতে মুল বক্তব্য রাখেন সংস্থার ভাইসচেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া ও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সংস্থার পরিচালক (মইক্রোফাইন্যান্স) জনাব এ. কে. এম. হাবিব উল্লাহ আজাদ।

কৃতী শিক্ষার্থীরা পুরস্কার গ্রহণ শেষে তাদের প্রতিক্রিয়ায় বলে, সিদীপের এই পুরস্কার তাদের আরও ভাল করতে উৎসাহিত করবে। তারা তাদের শিক্ষাজীবনের সাফল্যের পিছনে মায়ের ও বাবার অবদানের কথা স্মরণ করে আবেগময় হয়ে ওঠে।

সংস্থার সম্মানিত চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যান তাদের আলোচনায় শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় ভাল ফল করার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে অনুপ্রাণিত করেন। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা সিদীপ কর্মীর মেধাবী সন্তানদের জন্য এ ধরনের উদ্যোগ আরও বিস্তৃত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

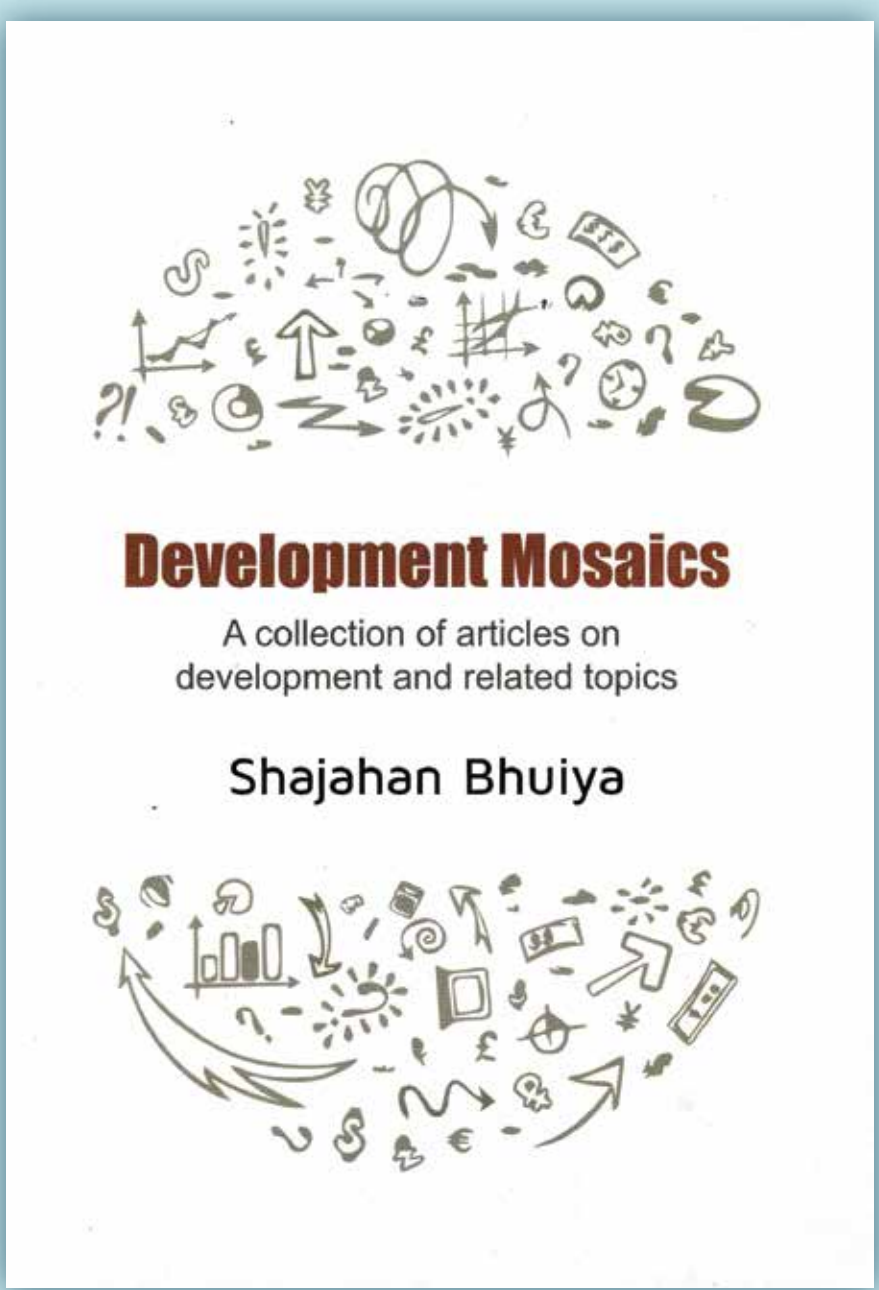
Development Mosaics
A collection of articles on
development and related topics
Shajahan Bhuiya